আলেক্সেই ক্রিলোভ

রিঅ্যাক্টরের ইতিকথা









'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

বিমান কেন উড়ে?

মোটর গাড়ি এবং ডিজেল এঞ্জিনকে কী চলতে বাধ্য করে?

কিসের জন্য আমাদের বাড়িঘরে এবং কলকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়?

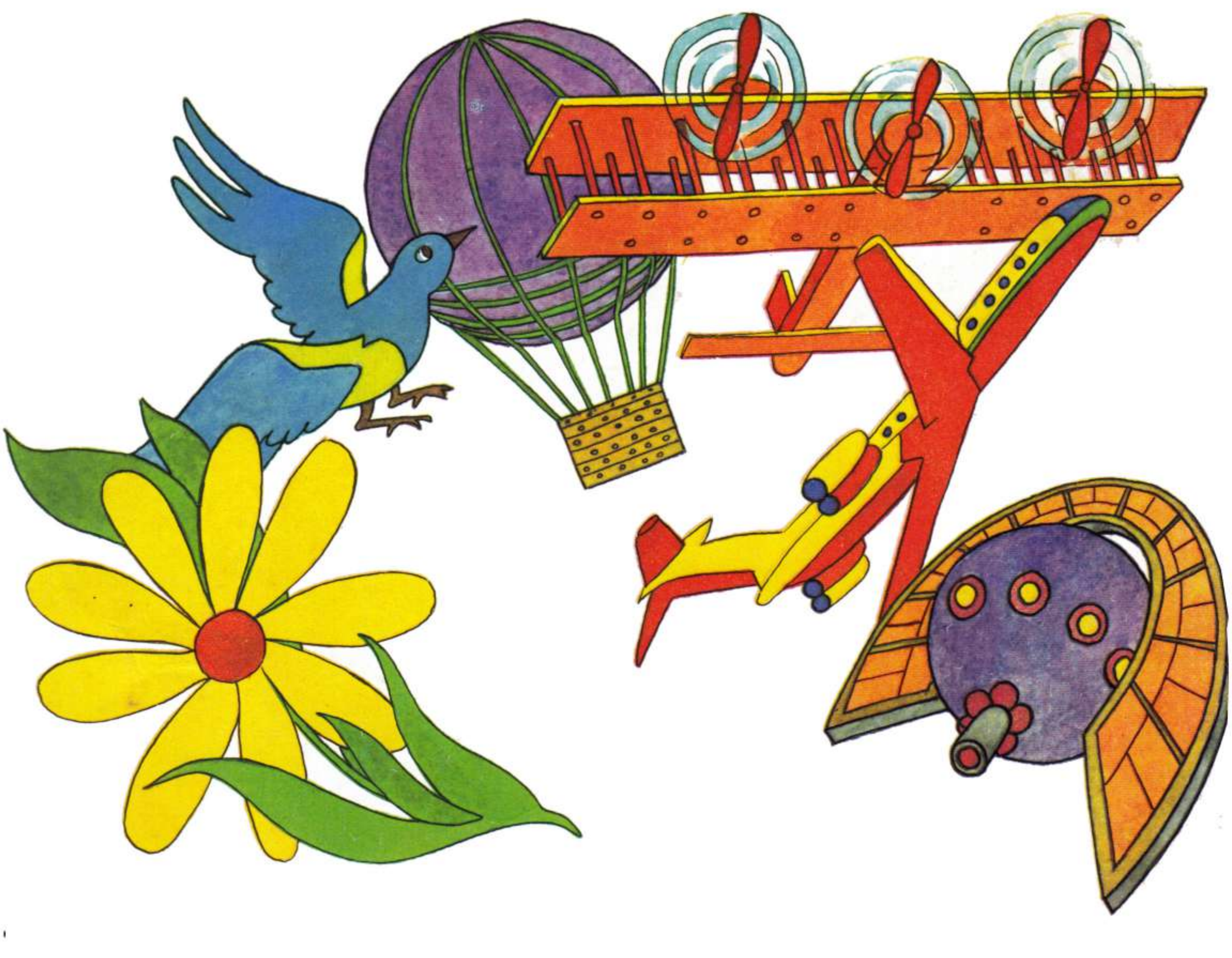
লোকে কেন খায়? সত্যিই, কেন, কিসের জন্য?..

আলেক্সেই ক্রিলোভ

রিঅ্যাক্টরের ইতিকথা

অনুবাদ: বিজয় পাল

অঙ্গসজ্জা: আন্দ্রেই প্লাতোনভ



А. Крылов

ОТ КОСТРА ДО РЕАКТОРА

На языке бенгали

A. Krylov

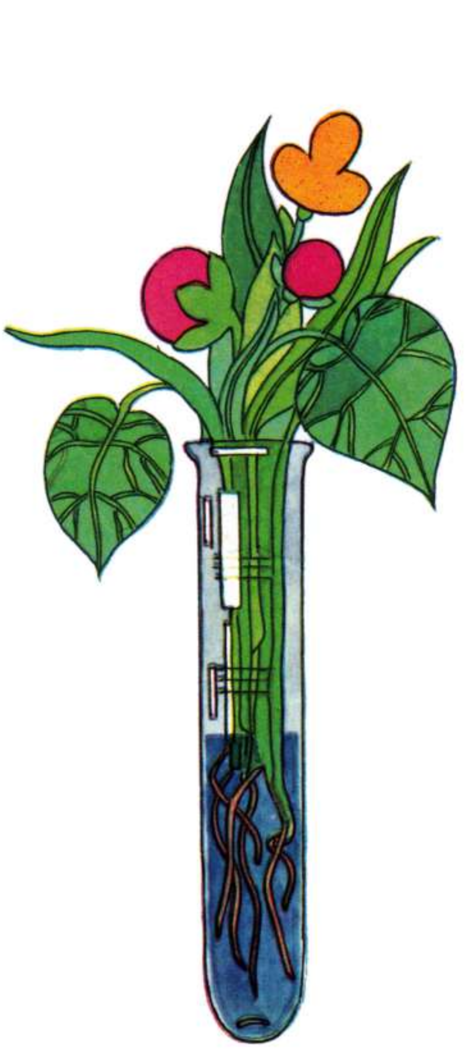
FROM THE BONFIRE TO THE REACTOR

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$K \frac{4803010102-257}{031(01)-84} 274-83$

সূচী





Al Fe2O3
H2O SO2
C6H14
O H2SO4


H
Cu
Si

তুমি দেখেছ, কীভাবে বাড়ি তৈরি করা হয়? নেওয়া হয় ইট কিংবা কংক্রিটের প্লেট, তা উপরে তোলা হয় এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়।

খোদ ইট এবং বাড়ি গড়ে মানুষে। তাদের সাহায্য করে বিভিন্ন ধরনের মেশিন: কংক্রিট-মেশানো যন্ত্র, ট্রান্সপোর্টার, ক্রেন, মোটর গাড়ি...

মানুষ এবং মেশিন যাতে কাজ করতে পারে — মাল টানতে, তুলতে, ঠেলতে ও ঘুরাতে-ফেরাতে পারে — তার জন্য চাই শক্তি, অনেক শক্তি।

মানুষ শক্তি পায় কোত্থেকে? তা অবশ্য তুমি ছেলেবেলা থেকেই জান। মা-বাবা দাদা-দিদিমা হয়তো অনেক বারই তোমায় বলেছেন: 'না খেলে গায়ে জোর হবে কী ক'রে?' এবং এটা খুবই খাঁটি কথা। মানুষ শক্তি পায় খাদ্যের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, খাদ্যের সঙ্গেই সে পায় 'ইট', 'নির্মাণ সামগ্রী', যা দিয়ে সে গঠিত।

তা মেশিনগুলো শক্তি পায় কোত্থেকে? তারা কী 'খেয়ে বাঁচে'? মেশিনের খাদ্য হচ্ছে: তেল, গ্যাস, পেট্রল, পাথুরে কয়লা, পীট, কেরোসিন, বিজলী...

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান' — বলবে তুমি, 'একটি সুস্বাদু কাটলেট কিংবা এক গ্লাস দুধ এবং এক পিপে কালো তেল অথবা যা কেউ কখনও চোখেও দেখে নি সেই বিজলীর মধ্যে মিলটা কোথায়?' আপাতদৃষ্টিতে কোথাও মিল নেই। তবে একটু ভেবে দেখলে, মিল আছে অনেক জায়গায়।

কাটলেট, দুধ, মাখন লাগানো রুটি, পেট্রল, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রবাহ — এ সমস্তকিছুই শক্তি জোগায়।

এই অদৃশ্য শক্তি প্রয়োজন সবার এবং সর্বত্র। তা প্রয়োজন রেল এঞ্জিন গড়ে ওটাকে জায়গা থেকে সরানোর জন্য, শার্ট ও ব্যাগ সেলাইয়ের জন্য, রকেটকে উড়তে বাধ্য করার জন্য এবং বই পড়ার জন্য। শক্তি প্রয়োজন যাতে শিরায় শিরায় রক্ত বইতে পারে, যাতে পেশী শক্তিশালী হয়, যাতে মস্তিষ্ক ভালো কাজ করে...

...আমাদের দূর পূর্বপুরুষদের কত কষ্টই না করতে হয়েছে। তাদের ঘিরে ছিল অজ্ঞাত ও শত্রুভাবাপন্ন এক পৃথিবী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, ঠাণ্ডা, বন্য জন্তুজানোয়ার — এক কথায় বিপদ ছিল পদে পদে। এই সমস্ত শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীর

সঙ্গে সংগ্রামে আদিম মানুষকে ভরসা করতে হত কেবল নিজস্ব শক্তির উপর।

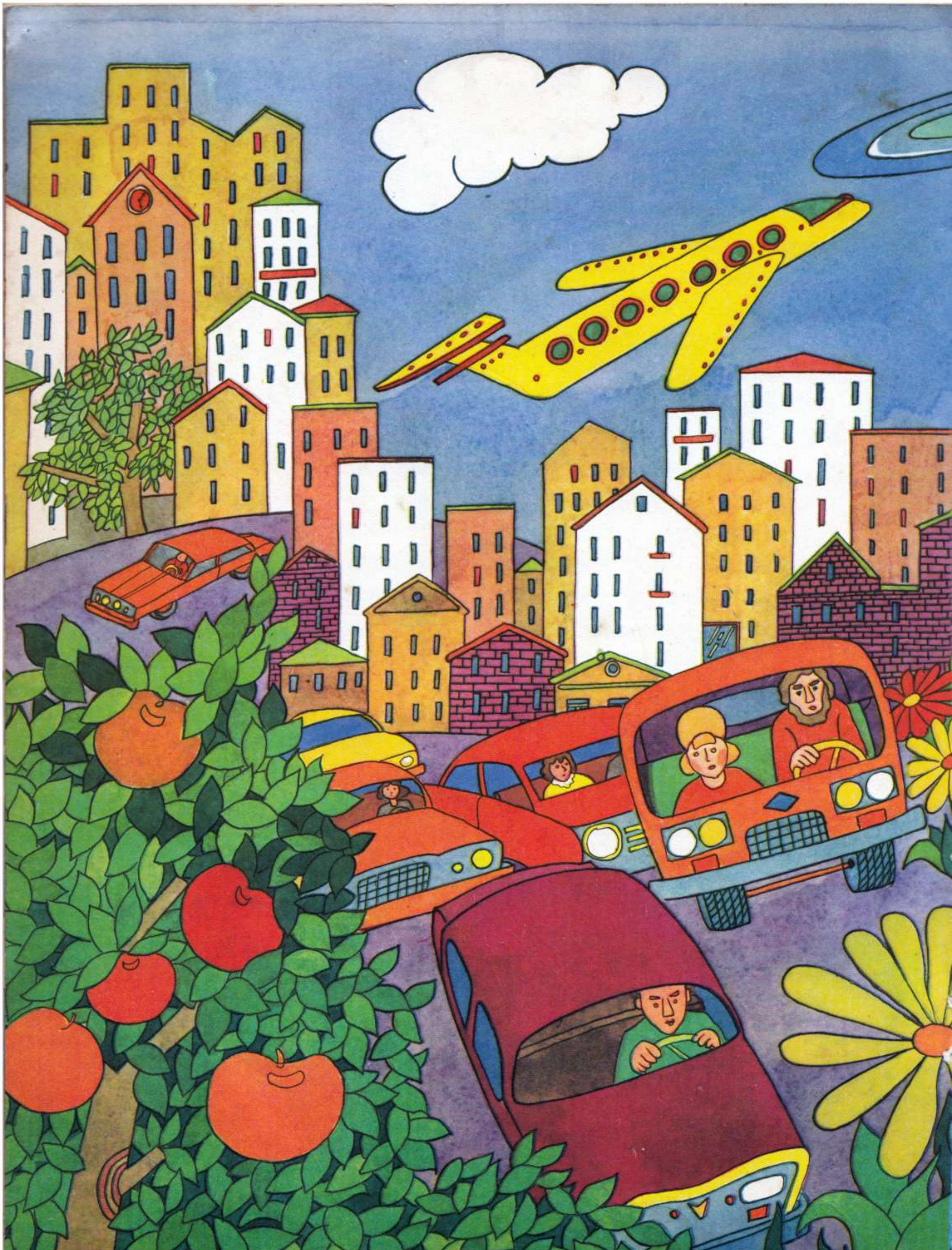
তবে তাদের সহায় ছিল কেবল নিপুণ হাত আর চট্‌পটে পা-ই নয়। হিংস্র জন্তুজানোয়ারেরাও দ্রুত বেগে ছুটতে পারত। মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি।

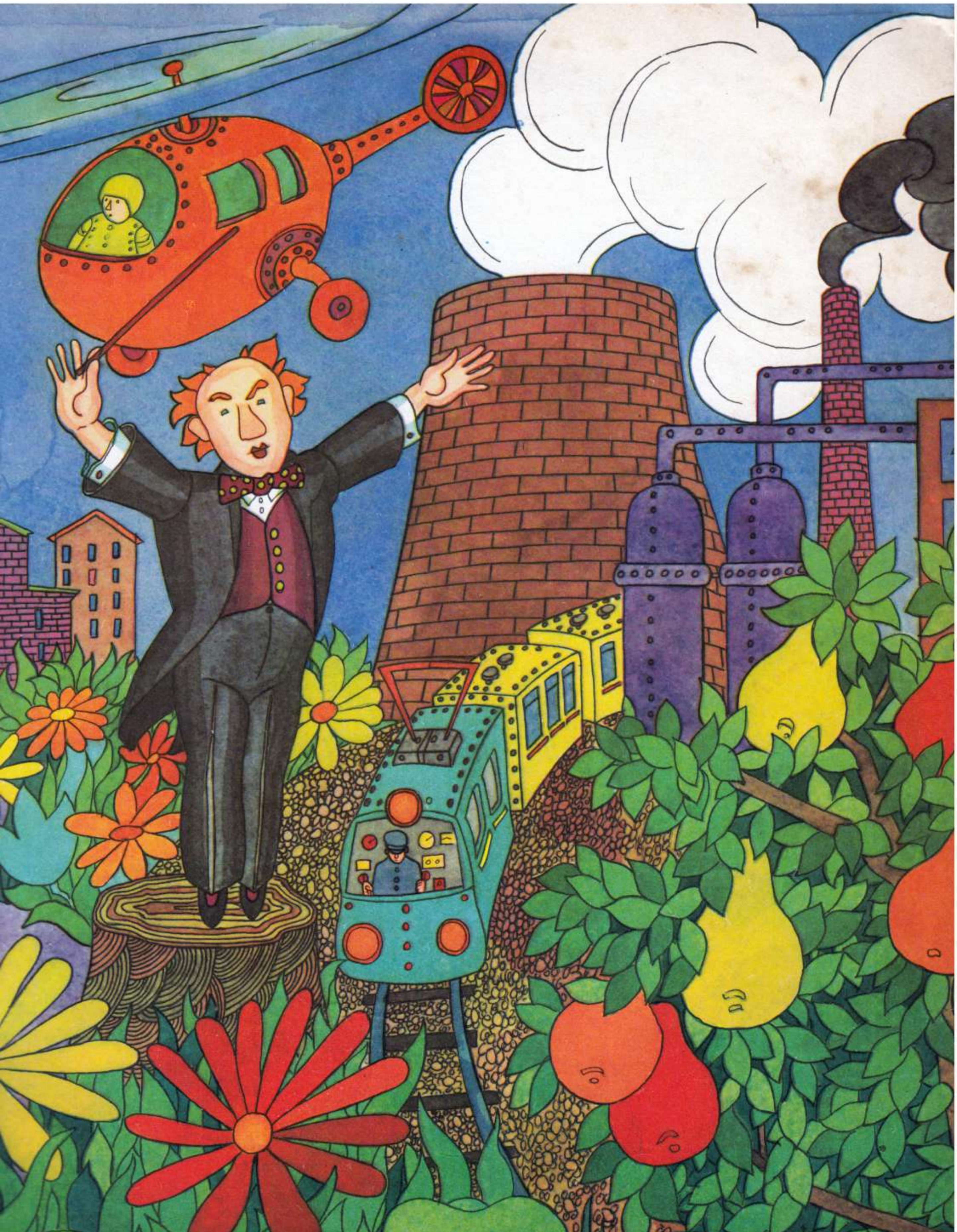
...বজ্রাঘাতে গাছে আগুন লাগল। বাতাস স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে নিয়ে গেল। তা থেকে আগুন ধরল পাশের গাছটিতে। জ্বলতে লাগল ঝোপঝাড়। ঘাসের উপর দিয়ে রক্তবর্ণ আগুন ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল বন। বন থেকে পালাতে লাগল ভীতসন্ত্রস্ত জন্তুজানোয়ারেরা। দূর আকাশে উঠে গেল পাখিরা। কেবল চর্ম পরিহিত গাট্টাগোট্টা একদল লোকই দাঁড়িয়ে থাকে বনপ্রান্তে। ভয়ে তারা অগ্নিকাণ্ডের স্থান থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু তারা জানে: আগুন শিগগিরই নিবে যাবে। এবং ক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখার পরিবর্তে থেকে যাবে জ্বলন্ত সোনালী কয়লার স্তূপ, ওই স্তূপগুলোর কাছে কনকনে শীতের রাতে মিলবে তাপ। আর ছাইয়ের নিচে খুঁজে পাওয়া যাবে পোড়া ও নরম আহারযোগ্য শিকড়...

তারপর কেউ একজন আগুন থেকে কিছুটা কয়লা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল স্তূপীকৃত শুষ্ক ঘাসের উপর। জ্বলে উঠল প্রথম ক্যাম্প-ফায়ার। মানুষ আগুনকে বশীভূত ক'রে পৃথিবীতে সবার চেয়ে শক্তিশালী হল।

কেন? কারণ, সে পেল শক্তির নতুন উৎস; দুর্ভিক্ষ, অন্ধকার আর হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে সংগ্রামে তা হল তার এক মহাশক্তিধর মিত্র।







সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় বলে দিই: কেউ কখনও শক্তি দেখে নি। তার কোন রঙ নেই, স্বাদ নেই, গন্ধ নেই। তা ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না। শক্তিকে 'দেখার' একমাত্র উপায়টি হল তাকে কাজ করতে বাধ্য করা।

আজ মানুষ এই অদৃশ্য বস্তুটির প্রায় সমস্ত রহস্যই জেনে ফেলেছে।

শক্তি হয় পাঁচ ধরনের: রাসায়নিক শক্তি, তাপ শক্তি, যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও পারমাণবিক শক্তি।

তবে আপাতত আমরা এই সমস্ত শক্তির 'স্বভাব ও চরিত্র' নিয়ে বিশদ আলোচনা করব না। এ সম্পর্কে কথাবার্তা হবে পরে। বইটি তো ওই জন্যই লেখা হয়েছে।

আর এবার কেবল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ও ক্ষমতা সম্পর্কে দু'-চারটা কথা বলব।

প্রথম ও প্রধান ধর্মটি আমরা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছি। সমস্ত ধরনের শক্তি 'কাজ করতে পারে'। প্রসঙ্গত, শক্তি কথাটি আবিষ্কৃত হয়েছে খুবই সম্প্রতি — গত শতাব্দীতে। আর তার আগে তা পরিচিত ছিল কাজ বলে।

শক্তির দ্বিতীয় ধর্মটি যেন ধর্ম নয়, একেবারে যাদু আর কি! দেখা গেল যে শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে তাপ শক্তিতে, আর তাপ শক্তি — যান্ত্রিক শক্তিতে...

মানুষ বহুকাল থেকেই এই চমৎকার ধর্মটি নিজের কাজে লাগাচ্ছে। তারা বিভিন্ন ধরনের মেশিন গড়েছে যা শক্তির রূপ পরিবর্তন করে।

প্রায়ই এমনটি ঘটে যে প্রয়োজনীয় রূপ পরিবর্তনের জন্য কেবল একটি মেশিন যথেষ্ট নয়। তখন লোকে মেশিনের সারি বসায়। মেশিনগুলো পরস্পরকে শক্তি দেয়; অনেকটা রিলে-রেসের দণ্ড হস্তান্তরের মতো। সত্যি যে খেলায় দণ্ডের কোন পরিবর্তন হয় না, বদলায় কেবল ধাবকরা। আর আমাদের রিলে-রেসে 'ধাবকও' (অর্থাৎ মেশিন) বদলায়, 'দণ্ডও' (অর্থাৎ শক্তি) বদলায়। পূর্ববর্তীর কাছ থেকে প্রতিটি মেশিন এক ধরনের শক্তি 'গ্রহণ ক'রে' পরবর্তীটিকে 'দেয়' অন্য ধরনের।

মেশিনের এরূপ সারি পৃথিবীতে আছে অনেক। তা আছে বিদ্যুৎ

কেন্দ্রগুলোতে, জাহাজে-স্টিমারে এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে।

প্রায় সব ধরনের শক্তিকেই মানুষ পরিণত করে যান্ত্রিক শক্তিতে। এটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি। তা রেলপথে ট্রেন চালায়, আকাশে বিমান তুলে, শার্ট 'সেলাই করে', মোটর গাড়ি আর খনন-যন্ত্র 'প্রস্তুত করে'। আমাদের হৃদয়ের যান্ত্রিক শক্তি শিরায় শিরায় রক্ত পরিচালিত করে, আর মাংসপেশীর শক্তি আমাদের চলার, লেখার ও কাজ করার সুযোগ দেয়।

তা ভালো কথা। কুঁদযন্ত্রে আমরা কোনকিছু পালিশ করলাম কিংবা মেশিনে একটি শার্ট সেলাই করে নিলাম। কিন্তু যে-শক্তি আমাদের এ কাজে সাহায্য করল তা গেল কোথায়? তা কিসে পরিণত হল? কোন যন্ত্রাংশে, শার্টে অথবা আরও কোনকিছুতে? না, তা এগুলোর কোনটাতেই পরিণত হয় নি।

আমরা শক্তি দিয়ে যা-ই করি না কেন শক্তি সর্বদা শক্তিই থেকে যায়। তার বিলুপ্তিও নেই, সৃষ্টিও নেই। তা কেবল রূপ পরিবর্তন করে।

মানুষের সেবা করার পর — যেমন, ইস্পাত গালাই, মাল পরিবহন কিংবা টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রদর্শনের পর — তা অবশ্যই রূপান্তরিত হয় তাপে, তাপ শক্তিতে।

এই তো দ্যাখো না: একখানি ডিজেল এঞ্জিন ছুটছে। তার পেছনে অনেকগুলো ওয়াগনের বিরাট একটি ল্যাজ... প্রতিকুল বাতাস এঞ্জিনের কপালে আঘাত করছে। যা পাচ্ছে তা-ই আঁকড়ে ধরছে। ওয়াগনগুলোর দেয়ালে ও ছাদে ঘষে যাচ্ছে। ট্রেনকে চলতে বাধা দিচ্ছে। ওয়াগনগুলোর তলায় রেলের উপর চাকার কট্-কট্ ঘট্-ঘট্ শব্দ হচ্ছে এবং তা-ও রেলে ঘষা খাচ্ছে। এই ঘর্ষণেই চলে যাচ্ছে এঞ্জিনের প্রায় সমস্ত শক্তি।

আর ঘর্ষণের ফলে যেকোন জিনিসই গরম হয়। তা যাচাই করা খুবই সহজ। নিজের হাতের তালু দুটি একটু ঘষে দ্যাখো, — সঙ্গে সঙ্গেই টের পাবে তা গরম হয়ে উঠেছে।

এর মানে, ডিজেল এঞ্জিন তার কাজের দ্বারা রেল এবং বাতাস গরম করে? ঠিক তাই। পরে এই তাপ চলে যায় বায়ুমন্ডলে এবং তারপরে আরও দূরে — মহাকাশে।

একই ব্যাপার ঘটে মোটর গাড়ির ক্ষেত্রে। দূর পথ পাড়ি দেওয়ার পর তার চাকাগুলো একবার ছুঁয়ে দ্যাখো না। জান কী গরম লাগবে!

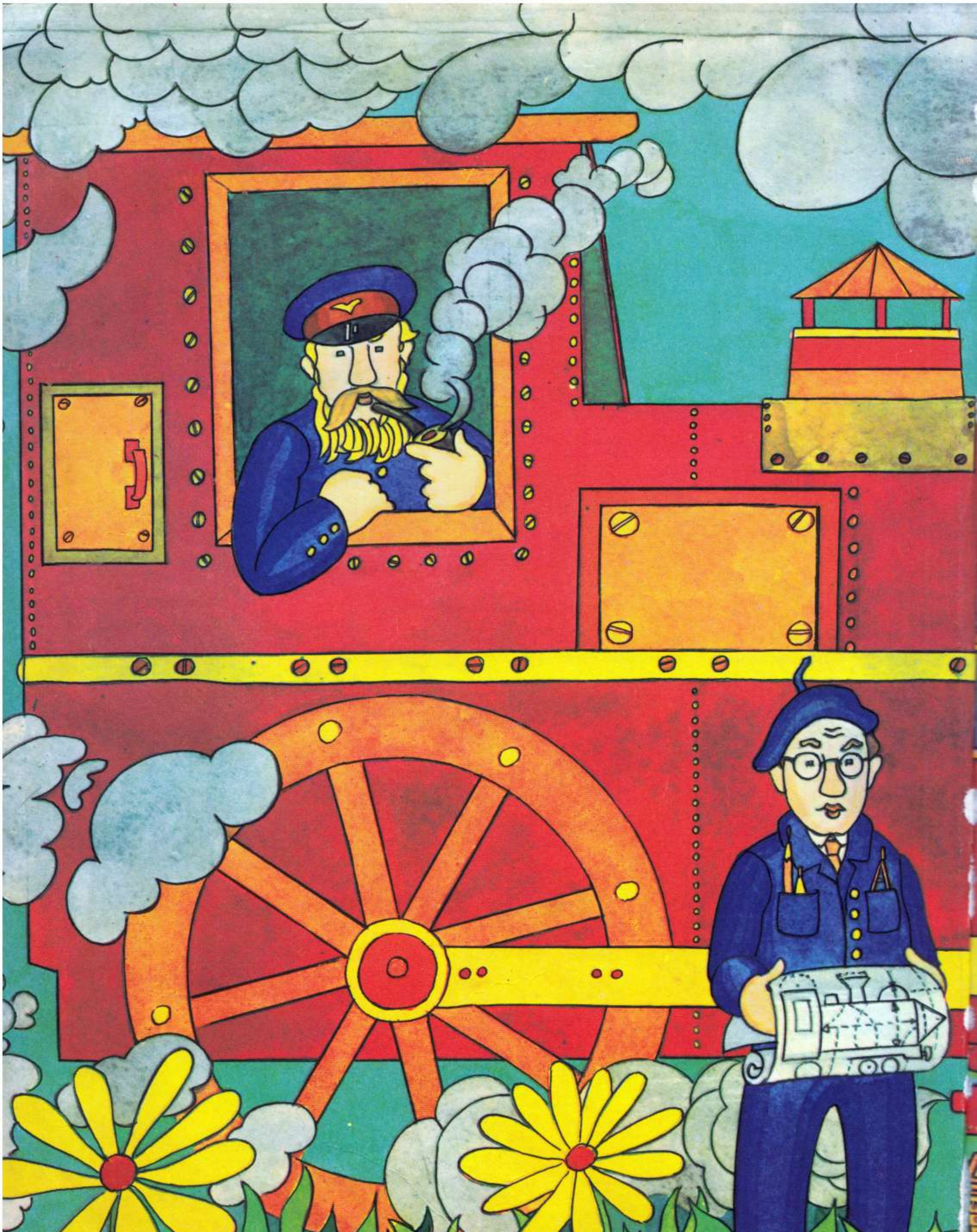
তাহলে এ থেকে কী দাঁড়াচ্ছে? পৃথিবী 'গরম করছে' মহাশূন্যকে? অবশ্যই।

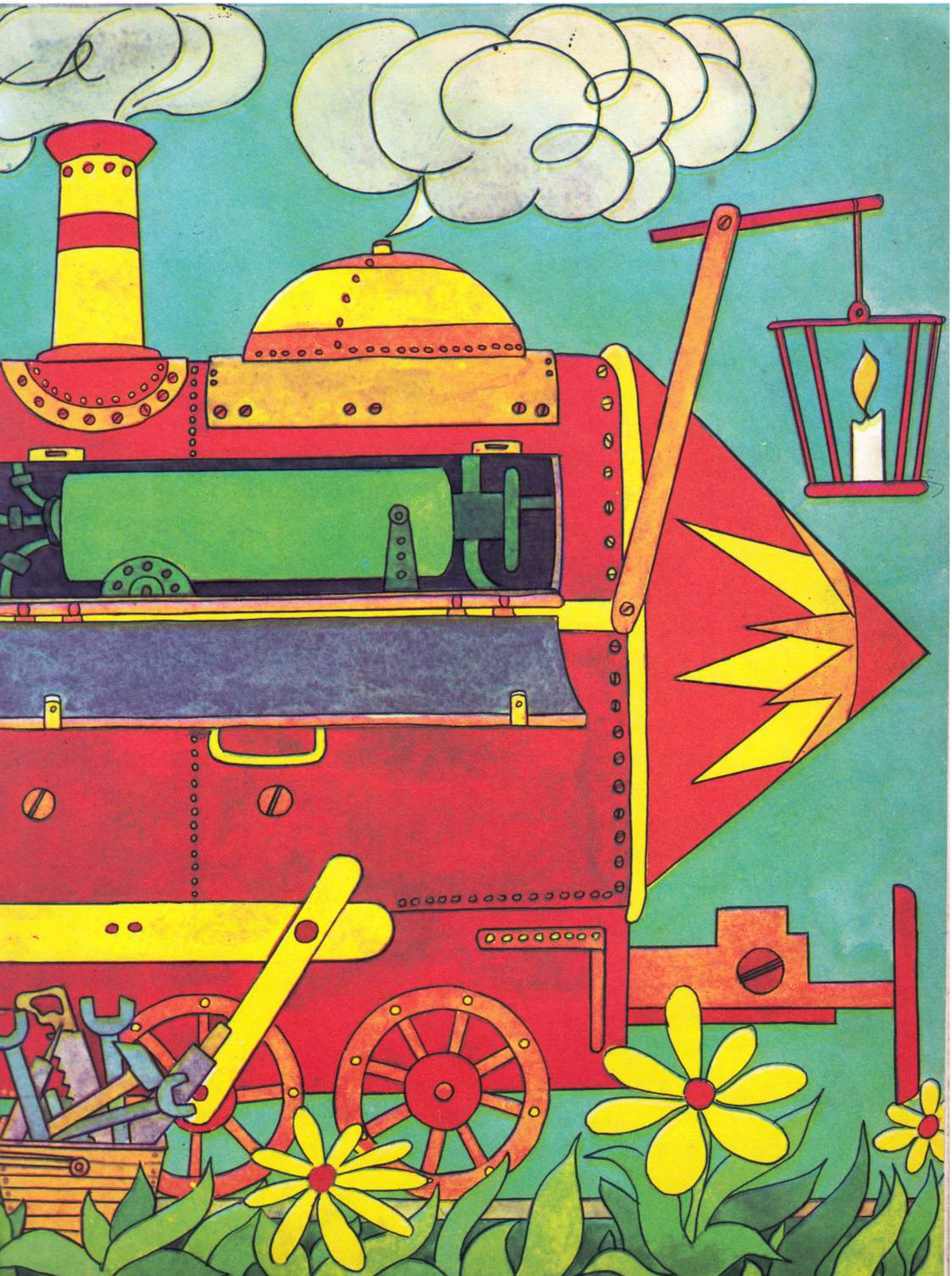
১৪ তবে মহাকাশ যে কেবল পৃথিবীর কাছ থেকে শক্তি নেয় তা নয়। তা আমাদের কাছে নিজস্ব শক্তিও পাঠায় — সেটা হল সৌর শক্তি। ওই শক্তি সঞ্চিত হয় উদ্ভিদে এবং পরিণত হয়... রাসায়নিক শক্তিতে। আগে হোক পরে হোক গাছপালা একদিন মরে যায়, আর তাদের ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হয় তেলে, গ্যাসে, পাথুরে কয়লায়, পীটে।

আজ পৃথিবীতে জ্বালানি হচ্ছে শক্তির প্রধান উৎস। আর ঠিক করে বললে, আপাতত প্রধান উৎস।

তা জ্বালিয়ে লোকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমগ্র শক্তি প্রস্তুত করে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বয়লারে, মোটর গাড়ি, জাহাজ আর বিমানের এঞ্জিনে, লোহা গালাইয়ের ব্লাস্ট ফার্নেসে এবং রকেটে প্রতি বছর যে-পরিমাণ জ্বালানি জ্বলে তার তাপ দিয়ে অনায়াসে ফুটানো যায় কৃষ্ণ সাগরের সমস্ত জল।







লোকে বলে অনেক অনেক বছর আগে চুলোর ধারে বসে ছিল একটি ছেলে। সে দেখছিল কীভাবে টগবগ ক'রে জল ফুটছিল ডেকচিতে। ঢাকনী ঠেলে বেরিয়ে আসছিল বাষ্প। ঢাকনীটি লাফাচ্ছিল আর শব্দ করছিল।

'কী ব্যাপার, ওটা এভাবে লাফাচ্ছে কেন?' ভাবল ছেলেটি। সে একটা ন্যাকড়া নিয়ে ঢাকনীটি চেপে ধরল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। অজানা এক শক্তি নিচ থেকে ঢাকনীটি ঠেলছিল। ছেলেটির নাম ছিল জেম্‌স ওয়াট।

যুগ যুগ ধরে লোকে জল ফুটিয়ে আসছিল। ডেকচিতে তারা সুপ রাঁধত, মাছমাংস আর শাকসবজি সেদ্ধ করত। জল যাতে তাড়াতাড়ি ফুটে উঠে সেই জন্য তারা ডেকচি ঢাকনী দিয়ে বন্ধ করে দিত।

ডেকচিতে যখন জল ফুটে, তখন বাষ্প সৃষ্টি হয়। ডেকচি যদি ভালো ঢাকনী দিয়ে বন্ধ করা হয়, তাতে বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা তখন সর্বদিকে চাপ দিতে শুরু করে: জলে, ডেকচির গায়ে এবং অবশ্যই ঢাকনীতে। বার হওয়ার পথ খুঁজে। শেষ পর্যন্ত বাষ্প ঢাকনী তুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঢাকনী বন্ধ হয়ে গেলে বাষ্প ফের ফাঁদে আটকা পড়ে। আবার তা জমা হতে থাকে এবং অবশেষে ঢাকনী তুলতে চেষ্টা করে। রান্নাঘরে এমন দৃশ্য তুমি নিজেই বহুবার দেখেছ। দুই শতাব্দী আগে জেম্‌সও ঠিক একই ব্যাপার লক্ষ্য করছিল।

পাথর, জলপূর্ণ বালতি কিংবা ওই ঢাকনীটি তোলার জন্য শক্তি প্রয়োজন। তার মানে, যে-বাষ্প ডেকচির ঢাকনীটি ঠেলে তুলছে তা এই শক্তির অধিকারী। এ কথা আগেও বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। ওয়াটের জন্মের শতাধিক বছর পূর্বেই দুই ইংরেজ যন্ত্রবিদ টমাস নিউকোমেন ও টমাস স্যাভেরি এমন মেশিন গড়েছিলেন যা জলীয় বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করত। বাষ্পীয় মেশিনগুলো কয়লা খনি থেকে পাম্প ক'রে জল তুলত, কয়লাপূর্ণ ট্রলি টানত, মালপত্র উঠাত-নামাত। কিন্তু ওই মেশিনগুলো ছিল কম শক্তিশালী, ভারী এবং ভীষণ 'পেটুক'। এক দিনে এককেটি মেশিন 'খেয়ে ফেলত' পর্বত পরিমাণ কয়লা আর টন টন জল। আর কাজের মতো কাজ করত এই একটুখানি।

জেম্‌সের যখন ষোলো বছর পূর্ণ হল তিনি মেকানিকেল ওয়ার্কশপে চাকুরিতে ভর্তি হলেন। ওখানে পাম্প মেশিন, বাষ্পীয় মেশিন মেরামত

করা হত। কালক্রমে তিনি একজন অতি নিপুণ যন্ত্রবিদ হয়ে উঠলেন, সৃষ্টি করলেন চমৎকার এক বাষ্পীয় মেশিন।

তা ছিল তিনটি ঢাকনীযুক্ত একটি 'ডেকচি'। দুটি আঁট ক'রে বন্ধ করা হত। আর তৃতীয়, অভ্যন্তরীণ ঢাকনীটি — চাপদণ্ড বা পিস্টন — চলতে পারত। কখনও চাপদণ্ডের উপর দিয়ে, কখনও নিচ দিয়ে ছিদ্রপথে বাষ্প যেত 'ডেকচিতে' — অর্থাৎ সিলিণ্ডারে, এবং তাতে চাপদণ্ড উঠা-নামা করত। চাপদণ্ড যুক্ত থাকত পাম্প কিংবা মেশিনের সঙ্গে। চাপদণ্ড চললে পাম্প কাজ করত ও মেশিন ঘুরত।

বাষ্প পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ বাষ্পীয় বয়লারে জল ফুটানো হত। তা থেকে পাইপ দিয়ে বাষ্প যেত মেশিনে।

অন্যান্যদের মেশিনের চেয়ে ওয়াটের মেশিনটি ছিল অনেক উন্নততর। তাতে জল ও কয়লা খরচ হত কম। মেশিনটি কাজ করত দ্রুত এবং তাতে লাভ হত বেশি।

ওয়াটের মেশিন দিয়েই শুরু হয় প্রসিদ্ধ 'বাষ্পের শতাব্দী'। কলকারখানার চিমনি দিয়ে উড়তে লাগল ধোঁয়া। নদী-সমুদ্রে চলতে শুরু করল প্রথম জাহাজগুলো। তাদের আর অনুকূল হাওয়ার অপেক্ষা করতে হত না। বাষ্পীয় মেশিনের সাহায্যে জাহাজকে পাল ছাড়া যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই নিয়ে যাওয়া যেত।

রেলের উপর দিয়ে ছুটল প্রথম স্টিম এঞ্জিনগুলো। একশোটি ঘোড়া একসঙ্গে যা মাল টানত তার চেয়ে ঢের বেশি মাল টানতে পারত এই সমস্ত এঞ্জিন। উদ্ভাবিত হল বাষ্পীয় মোটর গাড়িও। দুনিয়া বদলে যাচ্ছিল বড় তাড়াতাড়ি।

তবে ব্যাপারটি হঠাৎ ঘটে নি। এমনকি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন নি, তাঁদের হাতে কী বিরাট শক্তি রয়েছে।

একদা ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের কাছে এলেন সাদামাঠা পোশাক পরিহিত এক যুবক। তিনি সম্রাটের সামনে মেলে ধরলেন অসাধারণ এক জাহাজের নক্সা। তাতে পাল নেই, উঁচু মাস্তুল নেই। জাহাজের মাঝখানে ছিল লম্বা ও সরু একটি চিমনি। তা দিয়ে বেরচ্ছিল ধোঁয়ার কালো কালো কুণ্ডলি। জাহাজের উভয় পার্শ্বে দেখা যাচ্ছিল বিরাট বিরাট চাকা। তখনকার দিনে সে ছিল এক বিভীষিকাময় চিত্র। নেপোলিয়ন উদ্ভাবকের কথা শেষ পর্যন্ত না শুনেই তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। তার বারো বছর পরে সম্রাটকে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেণ্ট ইয়েলেনা দ্বীপে। হঠাৎ ডান দিকে দেখা গেল একখানি জাহাজ... তুমি ধরতে পেরেছ কোন্ জাহাজ? অবশ্যই ওই জাহাজটি। লম্বা চিমনি, বিরাট বিরাট চাকা। তাতে পত্‌পত্ ক'রে উড়ছিল নেপোলিয়নের মারাত্মক শত্রু

ব্রিটেনের পতাকা। পরে জানা গেল যে রবার্ট ফুল্টন — এই নাম ছিল জাহাজের উদ্ভাবকের — ফরাসি সম্রাট কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর সোজা ইংলণ্ডে চলে যান। ওখানে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উদ্ভাবন স্বীকৃতি লাভ করল...

রাশিয়ায় বাষ্পীয় মেশিন গড়েছিলেন বিখ্যাত যন্ত্রবিদ ইয়েফিম চেরেপানোভ এবং তাঁর পুত্র মিরন চেরেপানোভ। তাঁদের মেশিনগুলো কাজ করত আকরিক ক্ষেত্রে এবং কর্মশালায়। আর ১৮৩৪ সালে চেরেপানোভরা উরালে চালু করেন রাশিয়ার প্রথম রেলপথ, — তাতে ছিল স্টিম ট্র্যাকশন।

শত বছর ওয়াটের মেশিনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন মেশিন দেখা যায় নি। কিন্তু একদিন এক ঘটনা ঘটল।

ইংলণ্ডে আয়োজিত হল জাহাজের এক প্যারেড। জাহাজগুলো নিজ নিজ জায়গা নিল। নাবিকরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল ডেক-এ। এমন সময় জাহাজগুলোর সামনে দেখা দিল ছোট্ট একখানি জাহাজ। ওটাকে কেউ ওখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ করে নি। নৌ-সেনাপতি জাহাজটিকে বন্দরে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। তার পশ্চাদ্ধাবন করল সবচেয়ে দ্রুতগামী জাহাজটি। কিন্তু কে আর তার নাগাল ধরে। ছোট্ট জাহাজখানি অনায়াসেই দূরে চলে যায়।

তার ক্যাপ্টেন ছিলেন এঞ্জিনিয়র চার্ল্‌স পার্সন্‌স। তিনি নিজের জাহাজটিতে স্থাপন করেন নতুন এক এঞ্জিন — বাষ্পীয় টার্বাইন।

বাষ্পীয় মেশিন দেখতে ছিল পাম্পের মতো — উপর-নিচ, উপর-নিচ, আর টার্বাইন — ব্লেড বসানো লাটিমের মতো। প্রসঙ্গত, ল্যাটিনে 'টার্বো' মানে হচ্ছে লাটিম। পাইপ-নজ্‌ল থেকে বাষ্প ধারা বেরিয়ে ব্লেডগুলোকে আঘাত করে এবং তার ফলে টার্বাইন ঘুরতে থাকে।

পার্সন্‌স এই 'লাটিম'টি কাত ক'রে রাখলেন এবং টার্বাইনের বিমে স্ক্রু প্রপেলারটি মজবুত ক'রে স্থাপন করলেন। টার্বাইন ঘুরলে স্ক্রু প্রপেলারও ঘুরত, এবং ফলে জাহাজটিও দ্রুত এগিয়ে চলত।

আজ টার্বাইন কেবল সাগর-মহাসাগরই পাড়ি দেয় না। তার প্রধান কর্মস্থল — বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যেখানে তাপকে রূপান্তরিত করা হয় বিদ্যুতে।

একশো বছর আগে আরও একটি এঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়েছিল। তা-ও শক্তি পেত জ্বালানি থেকে। তবে জ্বালানি জ্বলত বাষ্পীয় বয়লারের অগ্নিকুণ্ডে নয়, খোদ এঞ্জিনটির অভ্যন্তরে। সেই জন্য তার নামই হল: অভ্যন্তরীণ দহনের এঞ্জিন বা ইণ্টারন্যাল কমবাশন এঞ্জিন। সংক্ষেপে — আই. সি. ই.।

তা দেখতে বাষ্পীয় মেশিনের মতো — সেই একই রকমের সিলিন্ডার আর চাপদণ্ড। তবে তার বাষ্পের প্রয়োজন নেই, বয়লার এবং মোটা মোটা বাষ্পীয় পাইপের প্রয়োজন নেই। তা কাজ করে এই ভাবে।

সিলিন্ডারে ঢালা হয় তরল জ্বালানি — তেল কিংবা পেট্রল। ওখানে তা জ্বলে উঠে, এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত গ্যাস। ওই গ্যাস চাপদণ্ডের উপর চাপ দেয় এবং তাকে ঠেলতে থাকে। আর চাপদণ্ড ঘোরাতে থাকে বিম যাতে লাগানো আছে চাকা কিংবা স্ক্রু প্রপেলার।

এঞ্জিনের উদ্ভাবক জার্মান এঞ্জিনিয়র রুডোল্ফ ডিজেল। পিটার্সবুর্গের 'রাশিয়ান ডিজেল' কারখানার শ্রমিক আর এঞ্জিনিয়ররা প্রায় ওই সময়ই নিজস্ব একটি মেশিন নির্মাণ করলেন। তা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট, হালকা, এবং সবচেয়ে বড় কথা, কাজ করত সস্তা জ্বালানি-তেল দিয়ে।

আজ অভ্যন্তরীণ দহনের এঞ্জিন হচ্ছে যানবাহনের প্রধান কর্মী। চারিদিকে একটু ভালো ক'রে চেয়ে দ্যাখো। নদী-সমুদ্রে চলেছে স্টিমার আর জাহাজ। রেলপথে খাটছে ডিজেল এঞ্জিন। রাস্তা দিয়ে ছুটছে মোটর গাড়ি। আকাশে উড়ছে বিভিন্ন ধরনের বিমান আর হেলিকোপ্টার। খেতে কাজ করছে ট্রাক্টর আর কম্বাইন। এ সমস্তকিছুই ভাসছে, চলছে কিংবা উড়ছে এই সাদাসিধে ও অল্পতে তুষ্ট এঞ্জিনটির কল্যাণে।

সর্বপ্রথম মোটর গাড়িটি নির্মিত হয়েছিল ফ্রান্সে — আজ থেকে দুশো বছর আগে। তা আধুনিক মোটর গাড়ির 'প্রপিতামহ'। ওতে স্থাপিত হয়েছিল বাষ্পীয় মেশিন আর বয়লার। প্রথম পরীক্ষা চলে প্যারিসে। সে ছিল যেন বিপুল সমারোহের ঘটনা। আগে আগে চলেছিল পুলিশরা, তারা ধর্মের ষাঁড়দের তাড়াচ্ছিল। তাদের পেছনে ধোঁয়া আর বাষ্পের কুণ্ডলির মধ্যে চলছিল মোটর গাড়িটি। আর তার পেছনে ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জল-ভরা কিছু পিপে ও কয়লার বাক্স। প্রতি দশ মিনিট পর পর সবাইকে থামতে হচ্ছিল। অগ্নিকুণ্ডে কয়লা ফেলতে হত, বয়লারে ঢালতে হত জল—এবং ফের যাত্রা। তবে এ সফর বেশিক্ষণ চলে নি। স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন স্বয়ং উদ্ভাবক। তিনি তা সামলাতে পারেন নি আর গাড়িখানা এক বাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আজ কিউনো'র — এই নাম ছিল উদ্ভাবকের — মেরামত ও পরিষ্কার করা মোটর গাড়িটি প্যারিসের যানবাহন মিউজিয়মে যোগ্য স্থান লাভ করেছে।

আর প্রথম খাঁটি মোটর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে ১৮৮৬ সালে।





ওটা নিজ হাতে গড়েছিলেন জার্মান যন্ত্রবিদ গটলিব ডাইম্‌লের। তিনি সাধারণ এক ঘোড়ার গাড়িতে নিজস্ব ডিজাইনের একটি পেট্রল এঞ্জিন স্থাপন ক'রে তা মোটর গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন।

রুশ নৌ-বাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন আলেক্সান্দর মোজাইস্কি একটি বিমান গড়েছিলেন। সেটাই ছিল আকাশযাত্রার ইতিহাসে প্রথম বিমান। তবে খুব বেশি ওজনের দরুন ওটা উড়তে পারে নি। তাতে লাগানো হয়েছিল ভারী একটি বাষ্পীয় মেশিন। বিমানটি কেবল ছুটতে এবং কয়েকবার উপরের দিকে লাফাতেই পেরেছিল। মোজাইস্কি নিজেই ভালো বুঝতে পারছিলেন যে বাষ্পীয় মেশিনে বেশি দূর যাওয়া যাবে না, বিমানের জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের এঞ্জিন, অপেক্ষাকৃত হালকা এবং ক্ষমতাসম্পন্ন।

ঠিক তাই ঘটল। ১৯০২ সালে আকাশে উঠল গ্যাসোলিনের মোটর যুক্ত একটি বিমান। তার নির্মাতা ছিলেন তরুণ মার্কিন যন্ত্রবিদদ্বয় ওর্ভিল ও উইলবের রাইট। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। উড়ার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উইলবের উড়ছিলেন প্রথম, তিনি বিমানের 'নাক'টি বেশি উপরের দিতে তুলে দেন, যার ফলে বিমান গতির বেগ হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে, কারো কোন ক্ষতি হয় নি। দু'সপ্তাহ বাদে বিমানের পাখায় শুলেন ওর্ভিল। করার কিছু নেই — ওই বিমানটি এভাবেই চালাতে হত। মোটর গর্জে উঠল, বিমান কিছু দূরে ছুটে গিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। তবে সে উড্ডয়ন চলে কেবল সতেরো সেকেন্ড...

এরূপই এক চমৎকার এঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন এঞ্জিনিয়ররা।

নিজের 'পিতামহী' — বাষ্পীয় মেশিনের কাছ থেকে এই এঞ্জিন উত্তরাধিকার সূত্রে বড় একটি খুঁতও পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ দহনের এঞ্জিন এবং বাষ্পীয় মেশিনের চাপদণ্ডগুলো কাজ করে সমানভাবে: উপর-নিচ, উপর-নিচ — এবং এঞ্জিনকে বিকল করে দেয়। এঞ্জিন যত শক্তিশালী হয় ততই বেশি বিকল করে। তা এমনকি নিজের চাপদণ্ডগুলোর 'আঘাতেও' ভেঙে পড়তে পারে।

আর টার্বাইনের, তুমি তো জানই, কোন চাপদণ্ড নেই। তাই ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাও নেই। সেই জন্যই ওগুলো হতে পারে অতি শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর।

খুবই সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে, লেনিনগ্রাদের ধাতু কারখানায় তা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করা হয়। ওখানে নির্মিত হয় অসাধারণ এক বাষ্পীয় টার্বাইন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় যে-সমস্ত টার্বাইন কাজ করত তা একাই ওগুলোর চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

এঞ্জিনিয়ররা ভাবতে লাগলেন। অভ্যন্তরীণ দহনের এঞ্জিন হালকা ও সাদাসিধে। তবে তার শক্তি খুব বেশি হতে পারে না। আর টার্বাইনের কথাই আলাদা। সে হচ্ছে এক অপূর্ব এঞ্জিন। কিন্তু তার জন্য চাই বয়লার। অথচ আধুনিক বাষ্পীয় বয়লারের উচ্চতা হয় পাঁচতলা বাড়ির সমান। আরও প্রয়োজন রেফ্রিজারেটর, পাইপ, পাম্প...

'তা ইণ্টারন্যাল কমবাশন এঞ্জিনের লঘুত্ব ও সারল্যকে টার্বাইনের ক্ষমতা ও গতির সঙ্গে যুক্ত করা যায় কি?' ভাবলেন এঞ্জিনিয়ররা; 'উত্তপ্ত গ্যাস চাপদণ্ডকে না ঠেলে বরং 'লাটিম' ঘোরাক।' এবং সত্যিই, এরূপ এক এঞ্জিন উদ্ভাবিত হল। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে তা নির্মিত হয় এবং তার নাম গ্যাস টার্বাইন।

গ্যাস টার্বাইন দেখতে বাষ্পীয় টার্বাইনেরই মতো। তবে তা চলে বাষ্পে নয়, উত্তপ্ত গ্যাসের ধারাতে।

এ হচ্ছে অতি হালকা, ক্ষমতাসম্পন্ন ও বেগবান এক এঞ্জিন। তা যেন নির্মিত হয়েছে বিমানের জন্য। আজ গ্যাস টার্বাইন কাজ করছে প্রায় সমস্ত ধরনের বিমানে।

তুমি যদি কখনও সত্যিকার বন্দুক দিয়ে গুলি করে থাক, তাহলে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গুলিবর্ষণের সময় কাঁধে কীভাবে কুঁদোর আঘাত লেগেছিল। 'ধাক্কা'—বলে গুলিচালকরা। কিন্তু তা কেন ঘটে? তাহলে এসো, দেখা যাক গুলিবর্ষণ জিনিসটা কী। আমরা ট্রিগার টানি। বল্ট অথবা ট্রিগারের অগ্রভাগ আঘাত হানে কার্তুজের ক্যাপে। আঘাতের ফলে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। তা কার্তুজের বারুদে অগ্নি সংযোগ করে। বারুদের গ্যাস বিপুল শক্তিতে আঘাত হানে গুলির তলদেশে এবং... 'চারিদিকেও'। গ্যাসের ধাক্কা পেয়ে গুলি নল থেকে ছুটে বেরয়, আর বন্দুকধারী কাঁধে পায় আঘাত। যে-শক্তি বন্দুক এবং শিকারীর উপর চাপ দেয় তার নাম হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ শক্তি।

তা কার্তুজ থেকে গুলি বার ক'রে খালি কার্তুজ দিয়ে যদি 'গুলি করা' যায়? ধাক্কা লাগবে কি? লাগবে। আর যদি বারুদ কিংবা জ্বালানি 'বন্দুকে' ভরা হয় অংশে অংশে নয় (যেমনটি করা হয় সাধারণ বন্দুকের ক্ষেত্রে), নিরবচ্ছিন্নভাবে? অথবা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাতে কার্তুজ সঙ্গে সঙ্গে না জ্বলে ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে? তাহলে রিঅ্যাক্টিভ শক্তিও 'বন্দুকের' উপর চাপ দিতে থাকবে নিরবচ্ছিন্নভাবে, এবং তাকে ধাক্কা দেওয়াও অব্যাহত রাখবে। রিঅ্যাক্টিভ এঞ্জিন ঠিক এই ভাবেই গঠিত।

লোকে বলে যে ভিয়েতনামে নাকি ছোট ছোট ছেলেরাই রিঅ্যাক্টিভ এঞ্জিন গড়তে পারে। প্রথমে নেওয়া হয় বাঁশের লাঠি। তাতে

ঢোকানো হয় বারুদ। বারুদে আগুন লাগানো হয়। দগ্ধ বারুদ থেকে সৃষ্ট গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং লাঠিটিকে সামনের দিকে ঠেলতে থাকে।

প্রকৃত রিঅ্যাক্টিভ এঞ্জিন অবশ্য তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে নয়, সবচেয়ে মজবুত ইস্পাত দিয়ে। তা ব্যবহৃত হয় বিমানে এবং রকেটে।

বিমানের এঞ্জিনগুলো কাজ করে তরল জ্বালানি — কেরোসিন দিয়ে। তবে রকটের এঞ্জিনগুলো তরল ও কঠিন উভয় ধরনের জ্বালানি দিয়েই কাজ করতে পারে। বিমানের এঞ্জিন এবং রকেটের এঞ্জিনের গঠনপদ্ধতির মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তা বোধগম্যও। উভয় ধরনের এঞ্জিনই কাজ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে।

বিমান উড়ে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি, বায়ুমণ্ডলে। অন্য কথায় বাতাসে, যা দহনের জন্যও প্রয়োজন। বিমানের 'বায়বীয়' এঞ্জিনগুলোতে বিশেষ এক ব্যবস্থা আছে। এর নাম বায়ু সংগ্রাহক যন্ত্র। বিমানের উড়ার সময় যন্ত্রটির প্রশস্ত খোলা 'মুখটি' প্রতিকূল বাতাস গিলতে থাকে। পরে তা ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে দহন কুঠরীতে প্রবেশ করে। ওখানে কেরোসিনও ঢালা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় জ্বালানি জ্বলে উঠে। নজ্‌ল থেকে উত্তপ্ত গ্যাসের ধারা বেরিয়ে এসে এঞ্জিনকে—এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিমানকেও—সামনের দিকে ঠেলতে থাকে। এ ধরনের এঞ্জিন তুমি সম্ভবত দেখেছ। 'তু-১০৪' বিমানের পাখায় এবং 'তু-১৫৪' বিমানের ল্যাজে রুপোলী সিগারের মতো জিনিসের কথা মনে আছে? ওগুলোই হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ এঞ্জিন।

রকেট উড়ে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। বায়ুহীন মহাকাশে। কথাটি লক্ষ্য কোরো—বায়ুহীন। কিন্তু জ্বালানিকে তো জ্বলতে হবে?..

সেই জন্যই রকেটে একই সঙ্গে থাকে জ্বালানি এবং বাতাস, আর ঠিক ক'রে বললে — অক্সিজেন।

রকেটের এঞ্জিন যদি তরল জ্বালানি দিয়ে কাজ করে, তাহলে তার কাজের জন্য প্রয়োজন দুটি ট্যাঙ্ক। একটিতে জ্বালানি, অন্যটিতে অক্সিজেন। জ্বালানি এবং অক্সিজেন প্রবেশ করে দহন কুঠরীতে। আর তার পর কী ঘটে তা তো তোমার জানাই আছে।

প্রকৃতপক্ষে রকেটে থাকে কয়েকটি ট্যাঙ্ক। এক জোড়া ট্যাঙ্কে জ্বালানি ও অক্সিজেন যখন শেষ হয়ে যায় তখন ওই ট্যাঙ্কগুলো রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর জ্বালানি ও অক্সিজেনের জোগান দেয় পরবর্তী ট্যাঙ্ক-জোড়া। তা যখন খালি হয়ে যায়, জ্বালানি ও অক্সিজেন দেয় তৃতীয় জোড়া...

কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুত্‌নিক) কিংবা মহাকাশযান প্রেরণের কথা তোমার মনে আছে? 'প্রথম ধাপ স্বাভাবিকভাবে সরে গেছে...

দ্বিতীয় ধাপ সরে গেছে... তৃতীয় ধাপ...' এই ধাপগ‍ুলোই হচ্ছে জ্বালানি ও অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক।

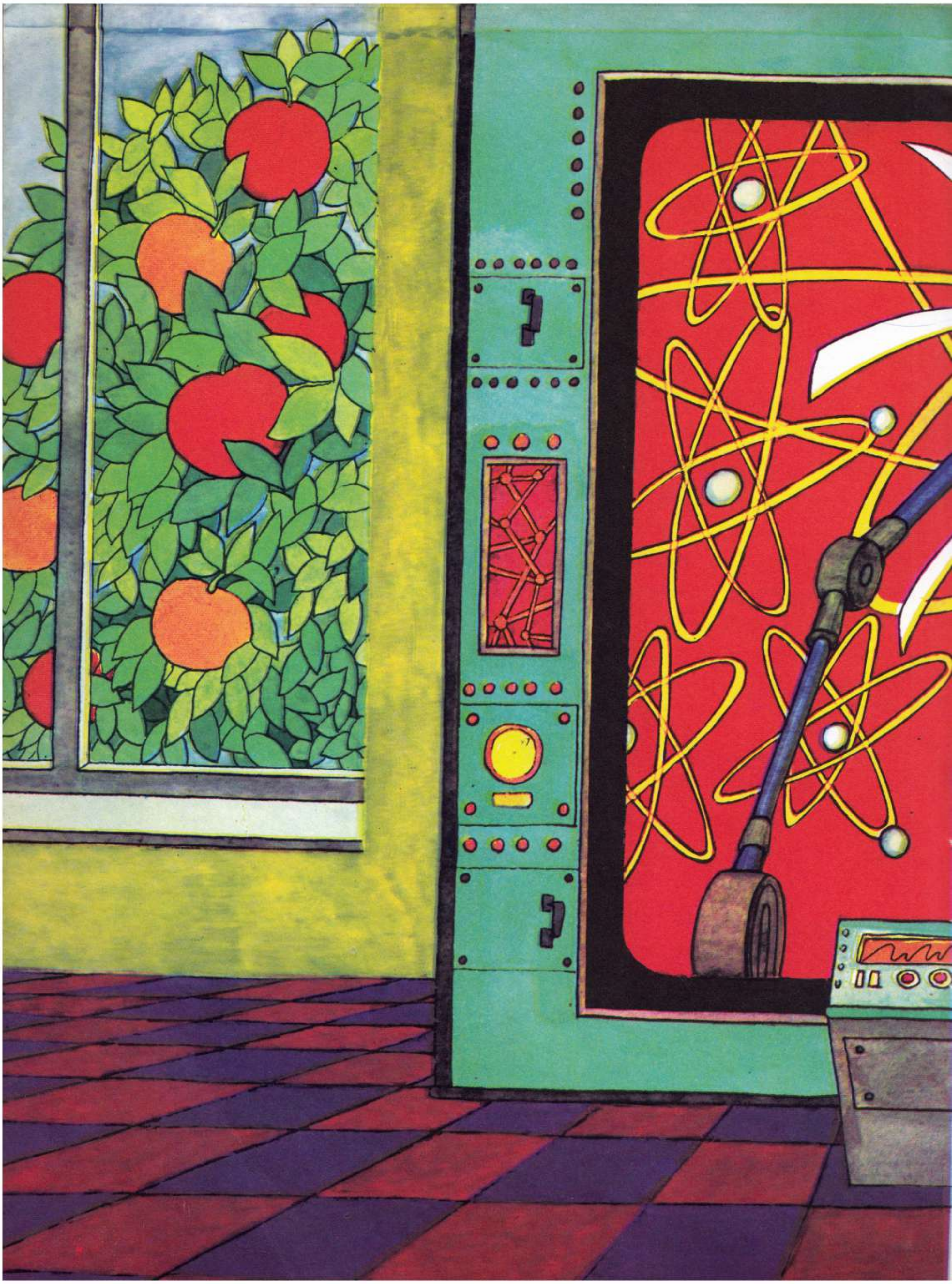
আর কঠিন জ্বালানি অক্সিজেনের সঙ্গে মেশানো হয় পৃথিবীতেই। তা জ্বলে সরাসরি ট্যাঙ্কেই। একটি ট্যাঙ্ক 'জ্বলে গেলে' তা সরে যায়, ফেলে দেওয়া হয়। তার পর জ্বালানি জ্বলতে শ‍ুর‍ু করে অন্য ট্যাঙ্কে। এগ‍ুলোকেও বলা হয় রকেটের ধাপ।

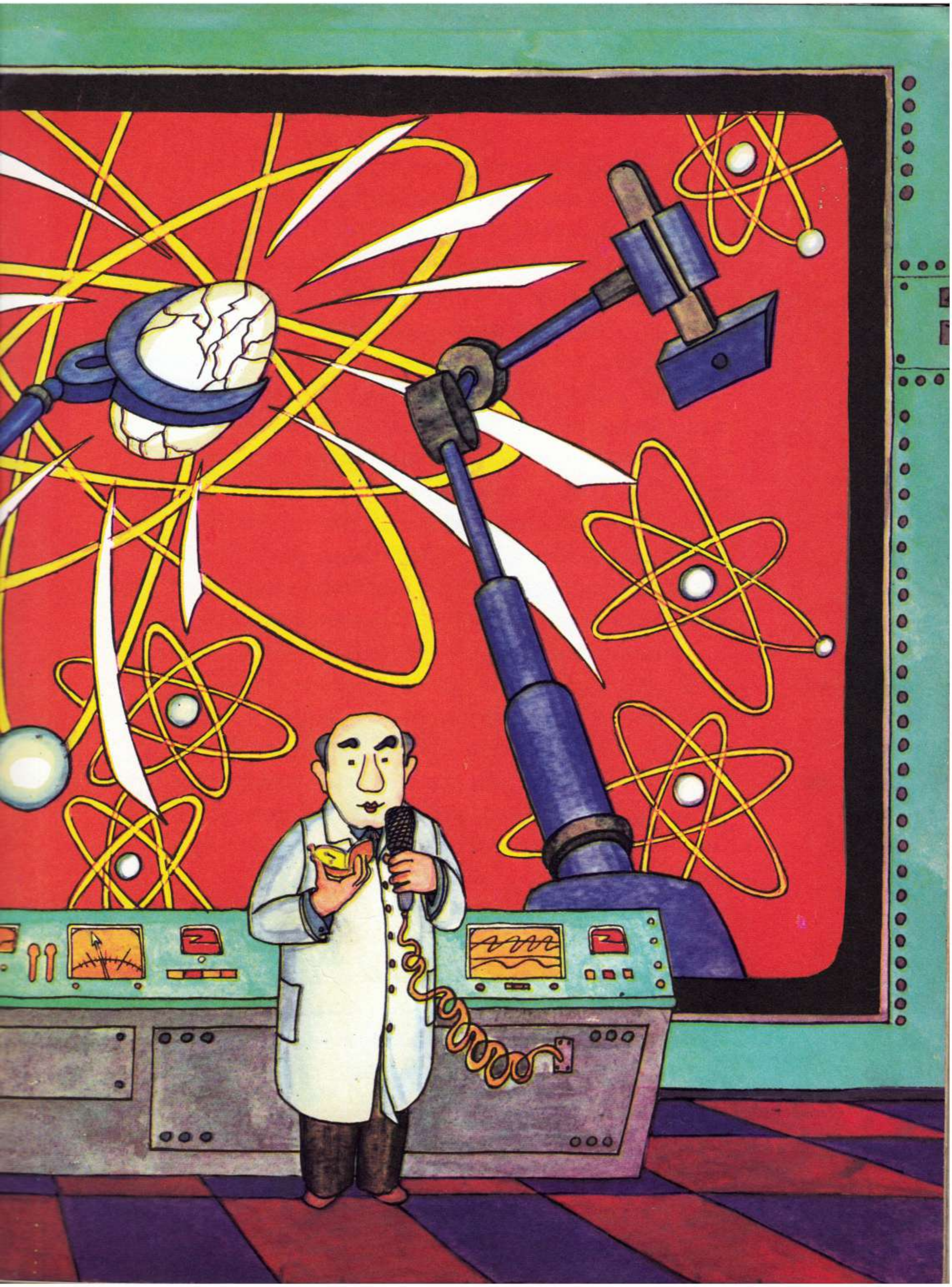
আমরা যে-সমস্ত এঞ্জিনের কথা বললাম তারা সবগ‍ুলোই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সমস্ত এঞ্জিনেরই কাজের জন্য জ্বালানি প্রয়োজন। তা জ্বলে তাপ শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই জন্য মেশিনগ‍ুলোর নামই তাপ-মেশিন।

এখনও পৃথিবীতে অনেক জ্বালানি আছে। তবে বছরে বছরে তার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে জ্বালানিতে আমাদের আরও শো-দেড়শো বছর কুলাবে, এবং তা-ও যদি আমরা তা মিতব্যয়িতা ও সতর্কতার সঙ্গে খরচ করি। আর তার মানে, মান‍ুষকে শক্তির প‍ুরনো উৎসগ‍ুলো ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং নতুন উৎসের সন্ধান চালাতে হবে।

সেই নতুন উৎসগ‍ুলো কী? এসো তাহলে, এবার তা নিয়েই আলোচনা করি।







তুমি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পারমাণবিক এঞ্জিন চালিত জাহাজের কথা শুনেছ? অবশ্যই শুনেছ ও পড়েছ। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বিজলী উৎপাদন করে, আর পারমাণবিক বরফ-ভাঙা জাহাজগুলো মালবাহী জাহাজের কারাভানের পথ করে দেয় মেরু মহাসাগরের বরফের মধ্যে।

পরমাণুর শক্তি মানুষ ব্যবহার করতে শিখেছে খুবই সম্প্রতি। বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ওবনিন্‌স্ক শহরে, কালুগার কাছে। তা চালু হয় ১৯৫৪ সালে। আর প্রথম পারমাণবিক জাহাজগুলো দেখা দেয় আরও পরে।

কিন্তু দেখা গেল যে এই পরমাণু বা অ্যাটম কথাটি মানুষের জানা আছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

২৩ শতাব্দী আগে প্রাচীন গ্রীসে ডেমোক্রিট নামে এক বিজ্ঞানী বাস করতেন। তিনি মানুষের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করতেন। ডেমোক্রিট ভাবতেন, কী দিয়ে 'নির্মিত হয়েছে' জিনিস ও বস্তু, জল ও পাথর, গাছপালা, ফুল এবং জীবজন্তু। তাঁর কাছে জটিল কোন যন্ত্রপাতি ছিল না যা আজ বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে। কিন্তু ডেমোক্রিটের মাথায়ই প্রতিভাদীপ্ত এক ধারণার উদয় হয়। তিনি কল্পনা করেন যে প্রকৃতিতে সমস্তকিছু কণিকা দিয়ে গঠিত। যেমন, বাড়ি গঠিত ইট দিয়ে। এই সমস্ত প্রাকৃতিক 'ইট' চোখে দেখা যায় না, এবং তার চেয়ে ছোট কোনকিছু পৃথিবীতে নেই। তা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। ডেমোক্রিট তাঁর কণিকাগুলোকে নাম দেন 'পরমাণু', যার মানে হচ্ছে 'অবিভাজ্য'।

বহু শতাব্দী বাদে বোঝা গেল যে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন।

প্রায় একশো বছর আগে ফরাসি পদার্থবিদ আঁরি বেক্কেরেল কাজের পর বাড়ি চলে যাওয়ার আগে তাঁর গবেষণাগারের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি আলমারিতে তুলে রাখলেন টেস্ট-টিউব আর ফ্ল্যাস্কগুলো। তাকে রাখলেন কালো কাগজ দিয়ে মোড়া ফোটোগ্রাফিক প্ল্যাট। আবারও ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে টেবিলগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। লক্ষ্য করলেন, একটি বস্তুর কয়েকটি টুকরো পড়ে আছে এক জায়গায়। বেক্কেরেল ওই বস্তুটির ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বস্তুটির নাম ছিল ইউরেনিয়াম। বিজ্ঞানীর খুব

তাড়া ছিল। তিনি টুকরোগুলো তুলে তাকের দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। একটি টুকরো ফোটোগ্রাফিক প্ল্যাটের প্যাকেটে গিয়ে পড়ল। বেক্কেরেল আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেলেন।

পরদিন বেক্কেরেল প্যাকেটের উপর থেকে টুকরোটি ফেলে দিয়ে প্ল্যাটে প্রয়োজনীয় ফোটো তুললেন এবং তা ডেভেলোপ করলেন। কিন্তু ফোটোগ্রাফিক প্ল্যাটটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেখানে পড়ে ছিল ইউরেনিয়ামের টুকরো সেখানে কালো একটি দাগ দেখা যাচ্ছিল। বিজ্ঞানী তো অবাক। ফের পরীক্ষা চালালেন: ব্যাপারটি কী বুঝতে হবে। আবার প্ল্যাটে দেখতে পেলেন ইউরেনিয়ামের টুকরোটির উজ্জ্বল 'প্রতিকৃতি'।

এই রহস্যটি উদ্‌ঘাটনের কাজে মন দিলেন অন্য বিজ্ঞানীরা — মারিয়া ও পিয়ের ক্যুরি। তাঁরা বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। বিজ্ঞানীদ্বয় রেডিয়াম আর পলোনিয়ামেরও অনুরূপ আচরণ লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তার কারণটি কী? ব্যাখ্যা হতে পারে কেবল একটাই। 'অবিভাজ্য' পরমাণুর সবচেয়ে গভীর থেকে কীসব কণিকার স্রোত আসে। ওই সমস্ত কণিকাই ফোটোগ্রাফিক প্ল্যাটগুলো নষ্ট বা এক্সপোজ করে। আর তার মানেটি দাঁড়াচ্ছে এই যে পরমাণুই ক্ষুদ্রতম কণিকা নয়। তারও চেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা আছে।

আজ আমরা প্রায় সঠিকভাবে জানি পরমাণু কীভাবে গঠিত। মধুর একটা বড় ফোঁটার কথাই ধরো যার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে উড়ছে অনেকগুলো মশক। মশকরা ফোঁটাটির কাছে ভিড় করছে, তা কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারছে না তারা। কোন বস্তুর পরমাণু যদি আমরা দেখতে পারতাম, তাহলে প্রায় অনুরূপ দৃশ্যই লক্ষ্য করা যেত। মাঝখানে ভারী একটা 'ফোঁটা' — নিউক্লিয়স। চারিদিকে হালকা, চটপটে 'মশকরা'—ইলেক্‌ট্রনগুলো। তা নিউক্লিয়সের চারিদিকে ঘুরছে যেন তার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। তবে ইলেক্‌ট্রনসমূহ ঘুরছে মশকদের মতো বিশৃংখলভাবে নয়, আপন আপন পথে — নিজস্ব কক্ষ ধরে।

কিন্তু তা-ও সব নয়। দেখা গেল নিউক্লিয়সও গঠিত পরস্পরের সঙ্গে জোরে চেপে-থাকা কণিকাসমূহ দিয়ে। এগুলোকে বলা হয় প্রোটন ও নিউট্রন। নিউক্লিয়স হচ্ছে দড়ি দিয়ে শক্ত-ক'রে-বাঁধা একটি স্প্রিংয়ের মতো এবং তা স্প্রিংয়েরই মতো প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। দড়িটি কেটে দিলেই স্প্রিংটি সোজা হয়ে উঠবে এবং তার মধ্যে লুক্কায়িত শক্তি দান করবে। নিউক্লিয়স যাতে শক্তি দেয় তার জন্য প্রয়োজন তা ধ্বংস করা, কণিকাসমূহকে জড়িয়ে রাখা অদৃশ্য সুতোগুলো ছিঁড়ে ফেলা। তখনই তা বিভক্ত হয়ে নিজের চারিদিকে শক্তি ছড়িয়ে দেয়।

সবচেয়ে সহজে ধ্বংস হয় (আর বৈজ্ঞানিক ভাষায় — বিভক্ত হয়) 'ভারী' পদার্থগুলোর — অর্থাৎ ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের নিউক্লিয়স। এগুলোকে ভারী বলে অভিহিত করা হয়েছে এই জন্য যে তাদের নিউক্লিয়সে আছে অনেক কণিকা। বিভাজনের পক্ষে নিউক্লিয়সে একটা কণিকার আঘাতই যথেষ্ট। ব্যাপারটিকে তুলনা করা যায় নিশানায় গুলির আঘাতের সঙ্গে। দেখা গেল যে সবচেয়ে ভালো 'গুলি' হচ্ছে নিউট্রন। সেই নিউট্রনই, যা দিয়ে গঠিত নিউক্লিয়স।

নিউট্রনসমূহের স্থায়ী 'বাসস্থান' হচ্ছে নিউক্লিয়স। তবে সর্বদা 'ঘরকুনো' এই নিউট্রনদের মধ্যেও ভ্রমণবিলাসী থাকে। তারা নিউক্লিয়স ত্যাগ করে চলে যায় এবং পর্যটকদের মতো ইউরেনিয়ামের টুকরোতে ইতস্ততভাবে ঘুরে বেড়ায়। আগে হোক পরে হোক এরূপ ভ্রমণকারী অন্য কোন নিউক্লিয়সের সঙ্গে ধাক্কা খায়। আঘাতের ফলে নিউক্লিয়স ভেঙে যায়, এবং তা থেকে দুটো নিউট্রন সৃষ্টি হয়। যেকোন উপায়েই হোক, ওই নিউট্রনগুলো পরবর্তী দুটি নিউক্লিয়সকে ভাঙাবেই। এবার ইউরেনিয়ামের টুকরোতে চারটি গুলি। ব্যস, চলল আর কি... কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটার সময় যেমনটি হয় ঠিক তেমনিভাবে নিউক্লিয়সগুলো একটির পর একটি চারিদিকে উড়তে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে লুক্কায়িত শক্তি ছড়াতে থাকে। বেশি শক্তি — বেশি তাপ। এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে যতটা তাপ পাওয়া যায় ঠিক ততটা তাপ মেলে দু'হাজার টন কয়লা জ্বালানোর পর।

ভারি মজার ব্যাপার, তাই না? ইউরেনিয়ামপূর্ণ সীসার একটি বা দুটি বাক্স-কণ্টেইনার নিয়ে এলেই যথেষ্ট — তা বড় কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুরো একটি বছরের খোরাক। তাই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো গড়া হয় সেই সমস্ত জায়গায় যেখানে কাছাকাছি কোথাও কয়লা, তেল কিংবা পীট নেই।

এরূপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সবচেয়ে প্রধান জিনিসটি হচ্ছে পারমাণবিক কিংবা, ঠিক ক'রে বললে, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর। এ হচ্ছে তলা ও ঢাকনী যুক্ত বিশাল এক ধাতব সিলিণ্ডার। তা দেখতে অবিকল বড় ডেকচি কিংবা বয়লারের মতো। বয়লারের ভেতরে — ইউরেনিয়ামের কীলক এবং জলের পাইপ। বাইরে, রিঅ্যাক্টরের ঢাকনীতে — নানান রকমের যন্ত্রপাতি আর কলকব্জা। ইউরেনিয়ামের কীলকগুলোতে নিউক্লিয়সের বিভাজন চলতে থাকে, 'জ্বলে' নিউক্লিয়ার জ্বালানি এবং জলকে ভীষণ গরম করে তুলে।

পাম্পগুলো উত্তপ্ত জলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় স্টিম-জেনারেটরে, অর্থাৎ বাষ্প উৎপাদক যন্ত্রে।

স্টিম-জেনারেটরের গঠন পদ্ধতিটি খুবই সহজ: পাইপের মধ্যে পাইপ। তাই বলেন এঞ্জিনিয়ররা। ভেতরের পাইপ দিয়ে রিঅ্যাক্টর থেকে বয় গরম জল। বাইরের পাইপ দিয়ে রেফ্রিজারেটর থেকে বয় ঠান্ডা জল—গরম জলের দিকে। রিঅ্যাক্টরের জলের তাপ পেয়ে ঠান্ডা জল গরম হয়ে উঠে, ফুটতে শুরু করে এবং পরে পরিণত হয় বাষ্পে। বাষ্প চাপ দেয় টার্বাইনের ব্লেডগুলোতে, এবং টার্বাইন ঘুরতে আরম্ভ করে।

তাপ দেওয়ার পর রিঅ্যাক্টরের জল ফের রিঅ্যাক্টরে চলে যায়, আবার তা গরম হয় এবং আবার যায় স্টিম-জেনারেটরে। যে-চক্রে জল প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় প্রথম সার্কিট।

আর বাষ্প টার্বাইন ঘুরিয়ে চলে যায় রেফ্রিজারেটরে। ওখানে তা শীতল হয়ে জলে পরিণত হয়। জল ফের স্টিম-জেনারেটরে বইতে থাকে এবং আবার বাষ্পে পরিণত হয়... জল ও বাষ্প সমেত এই দ্বিতীয় চক্রটির নাম: দ্বিতীয় সার্কিট।

রেফ্রিজারেটর সমেত রিঅ্যাক্টর, স্টিম-জেনারেটর আর টার্বাইনের মিলিত নামটি হচ্ছে — পারমাণবিক শক্তি ব্যবস্থা। তা চালায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং মানুষ — অপারেটর।

এ ধরনের ব্যবস্থা কাজ করছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং বরফ-ভাঙা জাহাজে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে টার্বাইন পরমাণুর শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে, আর বরফ-ভাঙা জাহাজের টার্বাইন পরমাণুর শক্তিকে রূপান্তরিত করে গতিতে। ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক শক্তি ব্যবস্থা বরফ-ভাঙা জাহাজগুলোকে সবচেয়ে পুরু বরফের মধ্য দিয়ে জাহাজের কারাভান নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত বরফ-ভাঙা জাহাজ 'আর্কতিকা' ('সুমেরু') বরফের রাজ্য অতিক্রম ক'রে একেবারে উত্তর মেরুতে গিয়ে পেঁাছে। তার আগে আর কোন বরফ-ভাঙা জাহাজের পক্ষেই তা করা সম্ভব হয় নি।

এ সমস্তকিছু পড়ে তুমি যদি আমাদের দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর, তাহলে আমরা মোটেই অবাক হব না।

প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় সার্কিটের জল কেন ফুটতে আরম্ভ করে এবং বাষ্পে পরিণত হয়? আর প্রথম সার্কিটে কোন বাষ্পই নেই?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। কীসের জন্য দুটি সার্কিট দরকার? সরাসরি রিঅ্যাক্টরেই কি বাষ্প পাওয়া যায় না? বাষ্প তৈরি করার মতো যথেষ্ট তাপ তো ওতে আছে।

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। প্রথম সার্কিটে জল ফুটে না, কারণ জল ওখানে থাকে ভীষণ চাপের মধ্যে। আর চাপ যত বেশি হয়, জল তত বেশি গরম করা প্রয়োজন যাতে তা ফুটতে আরম্ভ করে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দিতে হলে আমাদের বেশ দূর থেকে শুরু করতে হবে।

ইউরেনিয়াম 'জ্বলে' শান্তভাবে এবং তা মোটেই ভয়ানক নয়। তবে মানুষের পক্ষে ইউরেনিয়াম খুবই বিপজ্জনক। নিউক্লিয়স বিভাজনের সময় অসংখ্য 'টুকরো' ও কণিকা সৃষ্টি হয় যা প্রবল গতিতে বিভিন্ন দিকে উড়তে থাকে। এই প্রবাহকে বলা হয় রেডিয়েশন। রেডিয়েশন জীবন্ত সমস্তকিছুর পক্ষে ক্ষতিকর। সেই জন্য রিঅ্যাক্টরের চারিদিকে সর্বদা গড়া হয় কংক্রিটের মোটা দেয়াল। ওগুলোকে বলা হয় জীবতাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা।

পারমাণবিক শক্তি ব্যবস্থায় দুটি জলীয় সার্কিট থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিয়েশন থেকে আত্মরক্ষা করা। প্রথম সার্কিটের জল রেডিয়েশন দ্বারা 'কলুষিত' এবং ইউরেনিয়ামেরই মতো তা কণিকা ছড়ায়। আর এই 'কলুষিত', 'নোংরা' জলকে যদি বাষ্পে পরিণত করা হয়, তাহলে পাইপ, পাম্প এবং টার্বাইনও রেডিও-অ্যাক্টিভ বা তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠবে।

সেই জন্যই ঠিক করা হল: রিঅ্যাক্টরের তেজস্ক্রিয় জল 'অন্য' জলকে গরম করুক। পাইপের দেয়ালগুলো ক্ষতিকর কণিকা প্রবাহকে খুবই হ্রাস করে, যার ফলে দ্বিতীয় সার্কিটের জল অমলিন বা প্রায় অমলিন থেকে যায়। টার্বাইন এবং রেফ্রিজারেটরের চারিপাশে জীবতাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা গড়ার প্রয়োজনই নেই। লোকে ওগুলোর কাছে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে।

আপন দেহে রেডিয়েশনের ক্রিয়াকলাপ সর্বপ্রথম পরীক্ষা করেন পিয়ের ক্যুরি। এই নির্ভীক লোকটি কয়েক ঘণ্টা ধরে তাঁর একটি হাত রাখেন এক টুকরো রেডিয়ামের উপর। কিছুকাল পরে তাঁর হাতে পোড়া আর ঘা দেখা দিল। পিয়ের ক্যুরি সেরে উঠলেন। তবে লোকে বুঝতে পারল যে রেডিয়াম আর ইউরেনিয়াম নিয়ে খেলা করা উচিত নয়।

এখন এঞ্জিনিয়ররা ভালো প্রতিরক্ষা গড়তে শিখেছেন। তাই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ মোটেই বিপজ্জনক নয়। তা নির্মাণ করা যায় সরাসরি শহরে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি 'পরিষ্কার' এবং তা ধুলো, ছাই আর ধোঁয়া দিয়ে বায়ু দূষিত করে না।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর চারিদিকে এমনকি হট-হাউসও গড়া হচ্ছে। ওখানে ফলানো হয় শাকসবজি আর ফুল। ফিন উপসাগরের কাছে নির্মিত লেনিনগ্রাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জেলেদের সাহায্য করে। টার্বাইনগুলো শীতলকারী উষ্ণ জল গিয়ে পড়ে উপসাগরে। ওই জলে প্রচুর শেওলা জন্মে।

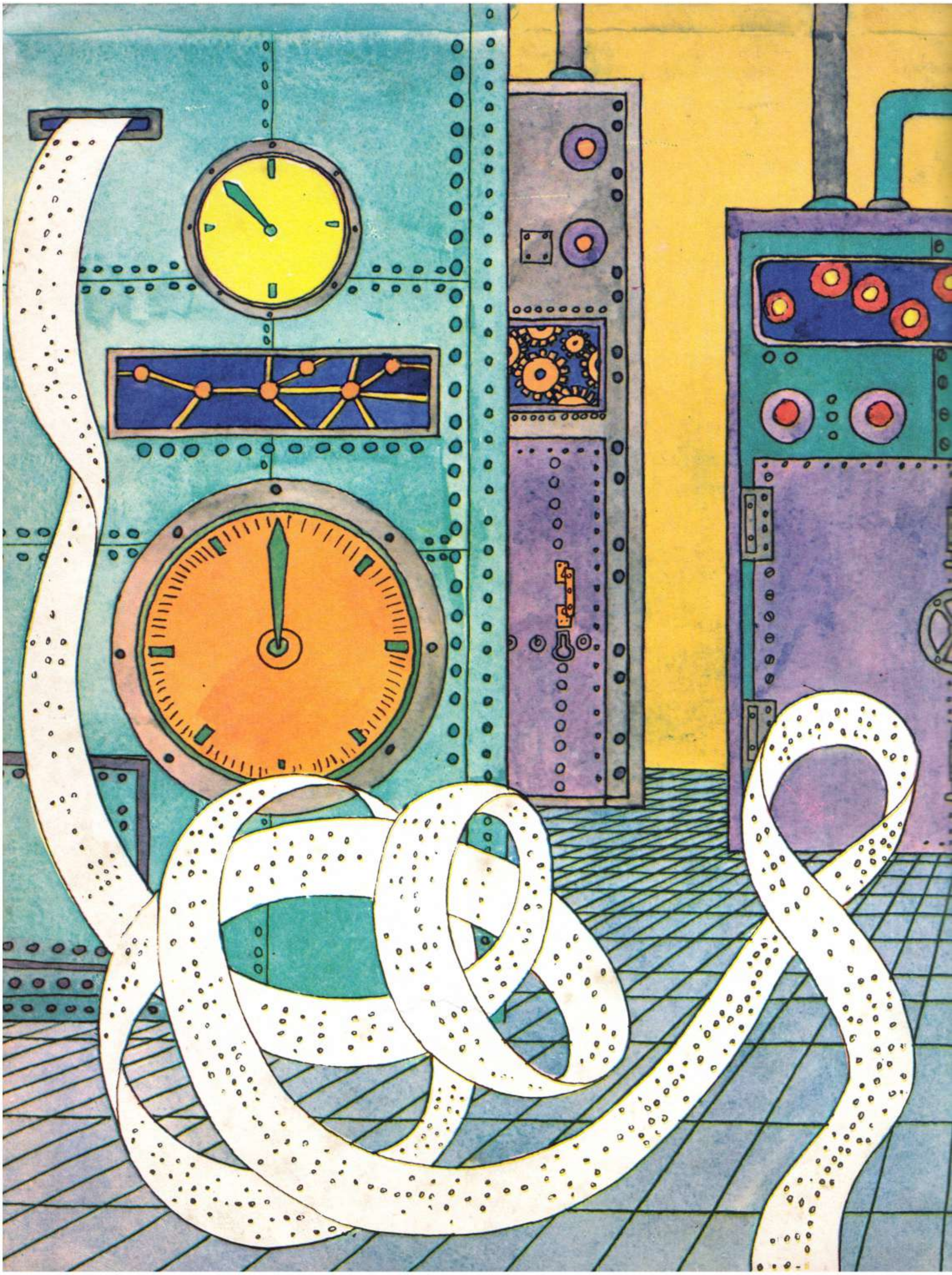
তা হচ্ছে মাছের খাদ্য। আর যেখানে খাবার আছে, সেখানে মাছও আছে।

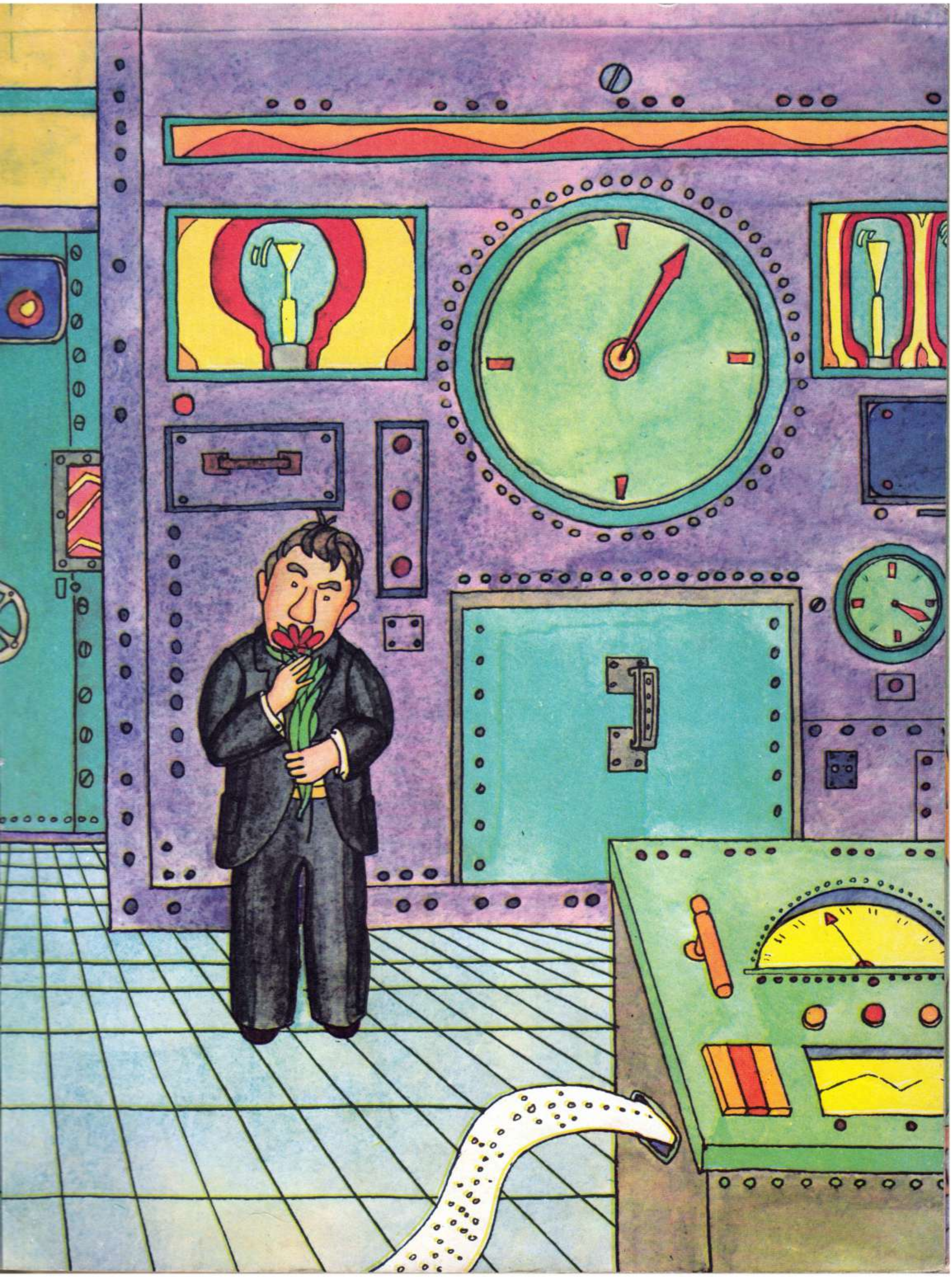
পারমাণবিক শক্তি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করবে। আজ পৃথিবীতে লবণহীন জলের পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। আর লবণহীন জলই আমরা খাই এবং তা দিয়েই আমরা স্নান করি। তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এই জন্য নয় যে আমরা বেশি জল খেতে আরম্ভ করেছি কিংবা ঘনঘন স্নান করছি। ক্রমশই অধিক পরিমাণ জল ব্যবহার করছে আমাদের শিল্প। তা প্রয়োজন কাঁচা লোহা ঢালাইয়ের জন্য, তৈল নিষ্কাশনের জন্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। অনেক জল দরকার কৃষি অর্থনীতির জন্যও। এমন সব জায়গা রয়েছে যেখানে আছে প্রচুর রোদ, উর্বরা মাটি। কিন্তু জল নেই। লোকে ওখানে খাল কাটে, পাম্পের সাহায্যে নদী ও হ্রদ থেকে জল নিয়ে যায় শুষ্ক প্রান্তরে।

পৃথিবীর প্রধান জল-ভান্ডার হচ্ছে সাগর-মহাসাগর। কিন্তু তোমরা জান, জল ওখানে লবণাক্ত। সমুদ্রের জল ব্যবহারের আগে তা লবণহীন করা হয়। ও কাজটি করা হয় এই ভাবে: লোনা জল ফুটানো হয়। তা থেকে বাষ্প উঠতে থাকে। ওই বাষ্প কণ্ডেন্সারে (ঘনীকরণ পাত্রে) সংগ্রহ ক'রে শীতল করলেই লবণহীন জল পাওয়া যায়। তার পর 'স্বাদের জন্য' সামান্য লবণ যোগ করলেই সেই জল খাওয়া যায়, তা দিয়ে স্নান করা যায়, কিংবা বাগানে ও খেতে সেচনকার্য সমাধা করা যায়। 'ডেকচি' থেকে কাইট সরিয়ে তাতে ফের লোনা সমুদ্র জল ঢালা হয়। তবে খোদ কাইটগুলোও কিন্তু দরকারী জিনিস। তাতে থাকে মূল্যবান পদার্থ: ম্যাঙ্গানীজ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এমনকি কিছুটা সোনাও।

জল লবণহীন করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ শক্তি। আর এই শক্তি জোগাতে পারে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে জলশূন্য উত্তপ্ত মরুভূমিতে অবস্থিত রয়েছে শেভ্চেঙ্কো শহরটি। তোমরা হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিয়েছ যে মাটি ওখানে একেবারে সমতল, প্রখর রৌদ্রে রাস্তাঘাট ফেটে খান খান হয়ে যাচ্ছে, ঘাস কিংবা গাছপালা কিছুই নেই। না, আসলে কিন্তু তা নয়। ওখানে জল আছে প্রচুর। আছে ছায়াচ্ছন্ন বীথি আর ফোয়ারা। শহরের সর্বত্র রয়েছে ফুল-বাগান। এই সমস্ত বিস্ময় সৃষ্টি করে মানুষ। শেভ্চেঙ্কোতে নির্মিত হয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ওখানে উৎপাদিত শক্তির প্রায় সমস্তটাই ব্যবহৃত হয় ক্ষমতাসম্পন্ন জলপরিশোধন কেন্দ্রে। তা শহরকে জোগায় জল আর শিল্পকে — কাঁচামাল: সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানীজ লবণ এবং আরও অনেককিছু।





কোন এক রূপকথায় বলা হয়েছে যে একবার দুই শেয়াল দিয়াশলাই নিয়ে গেল নীল সমুদ্রের ধারে, এবং আগুন লাগিয়ে দিল সেই সমুদ্রে। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল নীল সমুদ্র, আর দমকল বাহিনীর লোকেরা এসে পিঠে-পুলি ও শুকনো বেঙের ছাতা ছুঁড়ে নিভাল সে আগুন। 'আরে দূর, যত সব বাজে কথা' — বলবে তুমি; 'জল আবার জ্বলে নাকি? সমুদ্রের জল, নদীর জল, হ্রদের জল — কোন জলই জ্বলে না। জল দিয়ে বরং আগুনই নিভানো হয়।' ঠিকই কথা। তবে সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

জল নিজে জ্বলে না — সে ধ্রুব সত্য। কিন্তু মজার ব্যাপারটি হল এই: জল দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত যার একটি অনায়াসে জ্বলে, আর অন্যটি — জ্বলন কার্যে চমৎকার সাহায্য করে। জলজান ও অম্লজান (ইংরেজীতে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন)। এরূপ হচ্ছে ওগুলোর নাম। তবে এখানেই সব কথা শেষ নয়। 'স্বাভাবিক' জলজানের মধ্যে কখনও কখনও সাধারণ অণুর চেয়ে দ্বিগুণ ভারী অণু উপস্থিত থাকে। এরূপ জলজানকে বলা হয় ভারী জলজান বা ডিউটেরিয়াম। শক্তির প্রাচুর্য নিয়ে মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তার সঙ্গেই জড়িত।

বহুকাল আগে থেকেই জানা আছে যে ভারী জলজানের দুটি পরমাণু একত্র যুক্ত করলে নতুন একটি উপাদান — হেলিয়ামের নিউক্লিয়স মিলবে এবং অনেক শক্তি নিঃসৃত হবে। এক কিলোগ্রাম ডিউটেরিয়াম যে-পরিমাণ শক্তি দেয় ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি দিতে পারে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ কিলোগ্রাম কয়লা। অবশ্য তার জন্য যদি কয়লা জ্বালানো যায়।

আর তুমি জান, সাগর-মহাসাগরে কী পরিমাণ ডিউটেরিয়াম আছে? বিপুল পরিমাণ, তা দিয়ে মানবজাতির ৫০০০ কোটি বছর চলবে।

তবে দুটি নিউক্লিয়স একত্র যুক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। এর জন্য ডিউটেরিয়ামকে সূর্যের তাপমাত্রা — ২০ কোটি ডিগ্রি অবধি উত্তপ্ত করা প্রয়োজন! এবং একমাত্র এরূপ উত্তাপের মধ্যেই ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়সগুলো একত্রে মিলিত হবে ও তাদের মধ্যে লুক্কায়িত শক্তি দান করবে।

কিন্তু এরূপ নারকীয় উত্তাপে প্রকৃতির সমস্তকিছু বাষ্পীভূত হয়ে যায়, পরিণত হয় গ্যাসে — প্লাজমায়। তাহলে যে-যন্ত্রটিতে ডিউটেরিয়াম গরম করা হবে তা-ও গ্যাস হয়ে যাবে? অবশ্যই। তার মানে, কিছুই করা যাবে না? সুখের বিষয় যে আসলে তা কিন্তু ততটা নৈরাশ্যজনক নয়।

ব্যাপারটি এই যে প্লাজমা হচ্ছে পদার্থের কণিকা আর টুকরোর মিশ্রণ: ইলেকট্রন, নিউট্রন, নিউক্লিয়ার টুকরো এবং পরমাণুর আস্ত আস্ত নিউক্লিয়স। এর সবগুলোই বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত। বিজ্ঞানীরা এই সুযোগটাই নিলেন। তাঁরা প্লাজমাকে চুম্বক ক্ষেত্রে (ম্যাগনেটিক ফিল্ড-এ) 'ধরে রাখার' সিদ্ধান্ত নিলেন।

চুম্বক ক্ষেত্র কী? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করা যাক।

তুমি নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছ। ধাতুর এই টুকরোটি লোহার সমস্তকিছুই (পেরেক, পিন, ক্লিপ) নিজের দিকে টানে। নিজেও লোহার সঙ্গে 'আটকে থাকে'।

তুমি যে-সমস্ত বই পড়েছ কিংবা অদূর ভবিষ্যতেই পড়বে তার অনেকগুলোতে চুম্বক এবং লোহচূর্ণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা আছে। একখানি পিচবোর্ডে কিছুটা লোহচূর্ণ রাখো। পিচবোর্ডটির নিচ থেকে চুম্বক দিয়ে সামান্য আঘাত কোরো। লোহচূর্ণের স্তূপটি জাদুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। স্তূপের পরিবর্তে দেখা দেবে স্পষ্ট ও সুন্দর সুন্দর বৃত্ত। তা লোহচূর্ণ সৃষ্ট বৃত্ত। বলাই বাহুল্য, এখানে কোন জাদু নেই। ব্যাপারটি খুবই সহজ: লোহচূর্ণকে প্রভাবিত করেছে চুম্বক ক্ষেত্র, এবং তা বাধ্যের মতো তার শক্তি-রেখা (লাইন অব ফোর্স) বরাবর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে।

চুম্বকের চারিপাশে শক্তি-রেখা আছে সর্বদা — তা লোহচূর্ণ থাকুক আর নাই বা থাকুক। চূর্ণগুলো স্রেফ অদৃশ্য রেখাগুলোই 'ডেভেলোপ করে' — ফোটোর কাগজে ডেভেলোপার যেমন ছবি ডেভেলোপ করে তা অনেকটা তারই মতো। শক্তি-রেখার এই জালটিই চার্জযুক্ত প্রতিটি কণিকাকে নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য করে। তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে উড়তে দেয় না। চুম্বক মুষ্টি বিভিন্ন দিকে উড়ন্ত প্লাজমাকে চেপে সরু ফিতের মতো করে রাখে। ফিতে এবং যন্ত্রের দেয়ালের মাঝখানে শূন্যতা দেখা দেয়। এতে দেয়ালগুলো আস্ত ও অক্ষত থেকে যায়।

চুম্বকের চাপ (ম্যাগনেটিক প্রেস) আরও একটি ভালো কাজ করে। নিউক্লিয়সগুলো যাতে একত্রে মিলিত হতে শুরু করে তার জন্য

ওগুলোকে সংখ্যায় অনেক হতে হবে। তাহলেই নিউক্লিয়সগুলো সহজে পরস্পরকে খুঁজে পেতে পারে। চুম্বক ক্ষেত্র 'নিউক্লিয়সগুলোকে একটি স্তূপে জড় করে', আগে হোক পরে হোক তারা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, একত্রে মিলিত হয় এবং শক্তি নিঃসৃত করে। কিন্তু...

কিন্তু এ সমস্তকিছুই আপাতত স্বপ্ন। আজ অবধিও পৃথিবীতে কেউ ডিউটেরিয়ামকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় গরম করতে এবং তার কাছ থেকে কার্যোপযোগী শক্তি সংগ্রহ করতে পারে নি। সত্যি যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা 'তকামাক' নামে এক সিরিজ যন্ত্র ডিজাইন ও আবিষ্কার করেছেন। 'তকামাকের' সর্বশেষ মডেলে ইতিমধ্যে ২ কোটি ডিগ্রি তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার চেয়ে মাত্র দশগুণ কম! আপাতত 'তকামাক' যন্ত্রগুলোতে শক্তি-খরচ হচ্ছে যা শক্তি পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

প্লাজমাকে বশীভূত করা খুবই কঠিন কাজ। চুম্বক জালে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। যেই কোন ছিদ্র খুঁজে পায় অমনি তা প্রবল বেগে বাইরের দিকে ছুটতে থাকে। ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়সগুলো — আর এগুলোর জন্যই 'বোনা হয়' চুম্বক জালটি — তখন বিভিন্ন দিকে উড়ে যায়, এবং আবার সবকিছু আরম্ভ করতে হয় একেবারে শুরু থেকে।

সেই জন্য বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়স থেকে শক্তি পাওয়ার অন্যান্য উপায়ও খুঁজছেন। যেমন, সোভিয়েত পদার্থবিদ আকাদেমিশিয়ান নিকোলাই বাসোভ অনুসৃত উপায়টির বিষয়ে বলা যাক। ভারী জলের ছোট্ট একটা ফোঁটা, যা ডিউটেরিয়ামের পরমাণু দ্বারা সম্পৃক্ত, ঠাণ্ডায় জমানো হয়। তার ফলে সেটি পিনের অগ্রভাগের সমান আয়তনের ক্ষুদ্র এক টুকরো বরফের আকার ধারণ করে। গুটিকাটির উপর ছাড়া হয় ল্যাসার রশ্মি। ল্যাসার — এ হচ্ছে ক্রিস্ট্যাল বা গ্যাসযুক্ত পাইপ, যা বিপুল শক্তিসম্পন্ন আলোক রশ্মি দিয়ে 'গুলিবর্ষণ করে'। রশ্মির 'আঘাতে' গুটিকাটি অত্যধিক মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তার মধ্যে অবস্থিত ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়সগুলো একত্রে মিলিত হতে এবং শক্তি নিঃসৃত করতে শুরু করে। ছোট্ট একটি বিস্ফোরণ ঘটে। রশ্মির তলায় নিয়ে আসা হয় নতুন একটা নিশানা (অর্থাৎ গুটিকা), তার পর আরও একটা... ফলে একটির পর একটি বিস্ফোরণ ঘটতেই থাকে।

প্রতিটি বিস্ফোরণ আলাদাভাবে দেয় অল্প শক্তি, তবে সবগুলো একসঙ্গে দেয় অনেক। বিজ্ঞানীরা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পেতে হলে প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষেও পারমাণবিক জ্বালানিযুক্ত কুড়িটা গুটিকা 'বিস্ফোরণ করা' প্রয়োজন।

গুটিকা-নিঃসৃত তাপ তরল লিথিয়ামকে উত্তপ্ত করবে। এ হচ্ছে এক ধরনের ধাতু। লিথিয়াম সে তাপ দেবে জলকে। ভারী জলকে নয়, সাধারণ জলকে। জল পরিণত হবে বাষ্পে, আর বাষ্প যাবে টার্বাইনে।

বিপুল তাপ হেতু (২০০ ০০০ ০০০ ডিগ্রি — চাট্টিখানেক কথা নয়!) নিউক্লিয়সগুলোর মিলনকে বলা হয় থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়া (ল্যাটিন ভাষায় 'থার্মো' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'উষ্ণ, উত্তপ্ত')।

প্রকৃতিতে — তবে পৃথিবীতে নয় — এই প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে অতি সাধারণ ব্যাপার। থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তি মানুষ তখনও ব্যবহার করত যখন তারা জানতই না যে তারা — মানুষ। থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কোটি কোটি বছর ধরে আমাদের মাথার উপর ঝুলছে, এবং তা হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত, অতি প্রিয় সূর্য।

তার অভ্যন্তরে বহু লক্ষ কোটি বছর ধরে চলছে অবিরাম থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়া। এই সুদীর্ঘ কাল পৃথিবীতে এসে পড়ছে শক্তির প্রবল এক ধারা।

সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক রিঅ্যাক্টরসমূহ, অর্থাৎ নক্ষত্রসমূহ। তবে তারা এতই দূরে অবস্থিত যে তাদের শক্তি আমাদের কাছে প্রায় পৌঁছয়ই না এবং তা নিঃসীম মহাকাশে হারিয়ে যায়।

থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়া ভালো কেবল শক্তির প্রাচুর্যের জন্যই নয়। তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা।

থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তিকেই খুব সম্ভব বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হবে। এ কথা সত্যি যে ওই স্টেশনগুলোর নাম কী হবে তা এখনও ভাবা হয় নি, তবে স্টেশনগুলো যে দেখা দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য আমাদের আর বেশিকাল অপেক্ষা করতে হবে না — বড় জোর দশ-পনেরো বছর। অন্তত বিজ্ঞানীরা তাই বলেন।

জলজানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও একটি চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। তা একদিন সবার পরিচিত পেট্রলের

স্থান নেবে। এর জন্য অন্তত পক্ষে দুটি কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণটি তোমাদের জানা। এঞ্জিনে পেট্রল জ্বালানো — সে হচ্ছে বোহিসেবীর মতো কাজ করা। মহান রুশ রসায়নবিদ দ্মিত্রি মেন্দেলেয়েভই বলেছিলেন যে তেল (কিংবা পেট্রল) জ্বালানো হচ্ছে টাকা দিয়ে উনুন ধরানোরই শামিল। এবং তা একেবারে খাঁটি কথা, বিশেষত আজ এ সত্যটি সবাই বুঝতে পেরেছে। আগেই বলা হয়েছে যে তেল দিয়ে প্রস্তুত করা যায় কাপড় ও ঔষধ থেকে শুরু ক'রে আহারযোগ্য এবং এমনকি সুস্বাদু ক্যাভিয়ার অবধি হাজারো রকমের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। অথচ এখন আমরা এই তেল ব্যবহার করছি পেট্রল, কেরোসিন আর ব্ল্যাক ওয়েল হিসেবে। আর তার মানে হচ্ছে আমরা জ্বালাচ্ছি তৈরি-না-হওয়া শার্ট, স্যুট, মেশিনের যন্ত্রাংশ, ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য...

এবার দ্বিতীয় কারণটি। আজ সঠিকভাবে জানা গেছে যে জ্বলনের বর্জ্য আমাদের গ্রহের বায়ুমণ্ডল দূষিত করে, এবং যতই সময় যাচ্ছে এরূপ অবস্থার ততই বেশি অবনতি ঘটছে। প্রতিটি মোটর গাড়ি বছরে বায়ুমণ্ডলে এক টন পরিমাণ অতি ক্ষতিকর পদার্থ নিক্ষেপ করে। তা প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে, সৌর রশ্মি আটকে রাখে, বড় বড় শহরের বায়ু বিষাক্ত ক'রে তুলে।

পৃথিবীর পথে পথে এখন চলছে ২৫ কোটিরও বেশি মোটর গাড়ি, আকাশে উড়ছে শত সহস্র বিমান, সমুদ্রগুলোতে চলাচল করছে হাজার হাজার জাহাজ, এবং প্রতিটি মোটর গাড়ি, প্রতিটি বিমান, প্রতিটি জাহাজ 'আকাশ মলিন করে'।

কিন্তু মানুষের অন্য উপায় নেই। সে নিরুপায়, কারণ তেল আর পেট্রলের মতো এত চমৎকার আর কোন জ্বালানি মিলছে না।

আপাতত মিলছে না। তবে ভবিষ্যতে খুব সম্ভব মিলবে। এরূপ জ্বালানি হতে পারে জলজান। এমনকি মিখাইল লমনোসভও* জানতেন যে জলজান আর অম্লজানকে একত্রিত করলে পাওয়া যায় জল, নিঃসৃত হয় তাপ।

এ ব্যাপারে আগ্রহী হলেন বিজ্ঞানী আর এঞ্জিনিয়াররা। অনেকে মনে করেন যে জলজানই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জ্বালানি। প্রথমত,

* মিখাইল লমনোসভ (১৭১১-১৭৬৫) — প্রথম রুশ প্রকৃতিবিদ, বিখ্যাত কবি, শিল্পী ও ইতিহাসবিদ। — সম্পাঃ

সাগর ও মহাসাগরের জলে তা সঞ্চিত আছে অতি বিপুল পরিমাণে। দ্বিতীয়ত, জলজান দহনের সময় কোথাও উবে যায় না। অম্লজানের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা সেই একই জল সৃষ্টি করে। সেই জন্য জলজান হচ্ছে সবচেয়ে 'নির্মল' জ্বালানি। 'জলজানের' এঞ্জিনের নির্গমন চিমনি দিয়ে বার হবে অক্ষতিকর জলীয় বাষ্প।

জলজানের জ্বালানি কাজ করতে পারবে যেকোন যানবাহনে, শিল্পে, বাড়িঘর গরম রাখবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

এখন রাসায়নিক পদ্ধতিতে জলজান উৎপন্ন করা হয় তেল থেকে। পদ্ধতিটি খুবই ব্যয়বহুল এবং তাতে জলজান মিলে কম। তবে অন্য একটি পদ্ধতিও রয়েছে — 'বৈদ্যুতিক' পদ্ধতি। এর নাম ইলেক্‌ট্রোলিজিস।

জলের মধ্যে ছাড়া হয় প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ। তা জলকে বিভক্ত করে জলজান এবং অন্যান্য অণুতে। জলজান হচ্ছে হালকা গ্যাস। তা উপরিভাগে উঠে আসে এবং জল থেকে 'লাফ মারে'। ঠিক তখনই তাকে 'ধরে' সিলিণ্ডারে সংগ্রহ করা হয়।

ইলেক্‌ট্রোলিজিসের জন্য অনেক বিদ্যুৎ প্রয়োজন। তাই আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি থাকলেই আমরা ঠিকমতো জলজান নিষ্কাশন করতে পারি। আর সে পর্যাপ্তি অর্জিত হবে একমাত্র তখনই যখন পৃথিবীতে ঠিকমতো কাজ শুরু করবে পারমাণবিক ও থার্মোনিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো।

তাহলে এরূপ একটি চেন দেখা দিচ্ছে: নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়া — বিদ্যুৎ — ইলেক্‌ট্রোলিজিস — জলজান, এঞ্জিনের জন্য জ্বালানি।

এঞ্জিনিয়ররা এমনকি ঠিকও করে ফেলেছেন, কার্যক্ষেত্রে এই চেনটি কীরূপ দেখাবে। সাগর-মহাসাগরে নির্মিত হবে ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ওগুলোর বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হবে জলজান নিষ্কাশনের কাজে। প্রাপ্ত জলজান পাইপ মাধ্যমে প্রেরিত হবে স্থলে। কারখানায় এই হালকা গ্যাসকে পরিণত করা হবে তরল পদার্থে এবং পাইপ মাধ্যমে কিংবা সিলিণ্ডারে ক'রে যাদের প্রয়োজন তাদের দেওয়া হবে।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। তরল জলজান এমনকি ঘরের তাপমাত্রায়ও দ্রুত উবে যায়। সেই জন্য যে-পাত্রে তা রাখা হয় সেই পাত্রটি এ'টে বন্ধ করা উচিত, তাই নয় কি? কিন্তু এমতাবস্থায় ঢাকনীর তলায় খুবই তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমাণ জলজান-

বাষ্প জমা হবে এবং পাত্রটি ফেটে যাবে। তাই জলজান রাখা হয় খোলা পাত্রে — ডিউয়ারে। ডিউয়ারের রহস্যটি হচ্ছে এই যে তা ঠিক ততটুকুই 'খোলা' যাতে ফেটে না যায় এবং যথাসম্ভব কম পরিমাণ জলজান নষ্ট হয়। ক্ষতির মাত্রা যাতে খুবই অল্প হয় সেই জন্য জলজানকে শূন্যাঙ্কের নিচে দুশো-আড়াই শো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড অবধি শীতল করা দরকার। সে হচ্ছে অত্যধিক শীতলাবস্থা। বোঝাই যাচ্ছে যে এরূপ 'থার্মোফ্ল্যাস্ক' প্রস্তুত করা খুবই কঠিন ও জটিল কাজ। বিশেষত মোটর গাড়ির জন্য। তা সাধারণ পেট্রল ট্যাঙ্কের চেয়ে বড় হলে চলবে না।

তাহলে এসো, এবার পেছন পানে তাকানো যাক। স্মরণ করা যাক, আমরা কী কী জানলাম, তার একটা খতিয়ান করি।

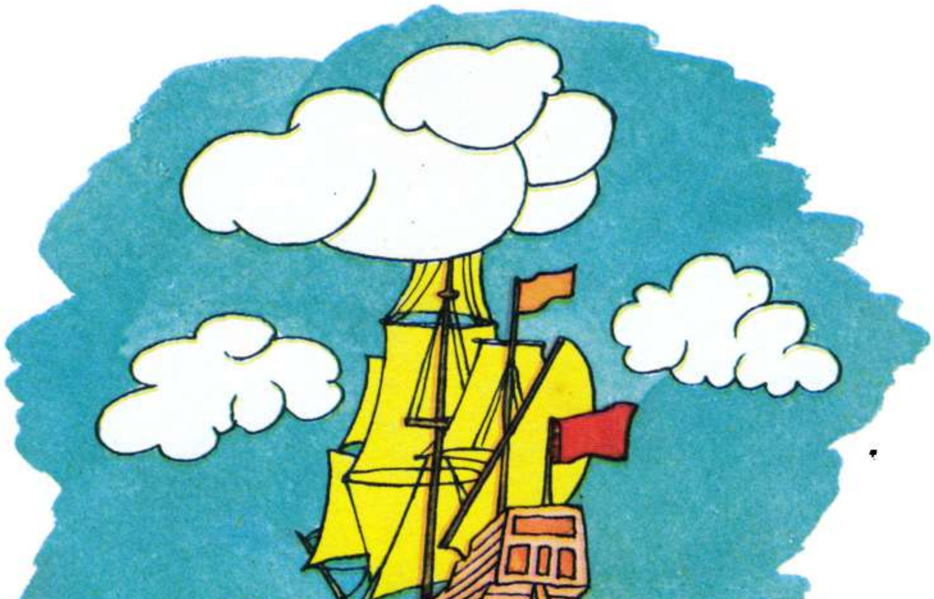
আমরা পরিচিত হলাম শক্তি লাভের দুটি চেনের সঙ্গে।

প্রথমটির শুরুতে — জ্বালানি। তার মধ্যে আছে রাসায়নিক শক্তি। জ্বালানি পুড়িয়ে আমরা এই রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করি। জ্বালানি চেনই হচ্ছে আজ প্রধান।

দ্বিতীয় চেনের গোড়াতে আছে পারমাণবিক নিউক্লিয়স, যা হচ্ছে পারমাণবিক কিংবা নিউক্লিয়ার শক্তির ভাণ্ডার। নিউক্লিয়স বিভক্ত ক'রে আমরা নিউক্লিয়ার শক্তিকেও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করি। অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিউক্লিয়সের মিলন থেকেও তাপ পাব। নিউক্লিয়ার চেন আজ প্রধান নয়। তবে ভবিষ্যতে তা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এই দুই চেনের জরুরী সংযোগ হচ্ছে তাপ, তাপশক্তি। জ্বালানি চেনে ও নিউক্লিয়ার চেনে তাপশক্তি ছাড়া লোকের চলতে পারে না এবং কোনদিন চলবে বলেও মনে হয় না...

তবে এই দুটি চেনই সব নয়। মানবজাতির হাতে শক্তির অন্যান্য উৎসও রয়েছে, আর তার মানে অন্যান্য শক্তি চেনও আছে। কোন-কোনটি লোকে কাজে লাগাচ্ছে অনেক কাল থেকে। আর কোন-কোনটির দিকে সবে তারা নজর দিচ্ছে।







এরূপ দৃশ্য হয়তো তুমি দেখেছ। কাঠের নালী থেকে ব্লেড-বসানো চাকায় পড়ছে জলধারা। চাকাটি ঘুরছে এবং বড় একটি চেপ্টা পাথর ঘোরাচ্ছে — ওটার নাম পেষণি। পাথরের মাঝখানে ছিদ্র। তাতে ঢালা হচ্ছে শস্য। পেষণি অচল এক ভিত্তির উপর ঘর্ষিত হচ্ছে এবং পেষণের মাধ্যমে শস্যকে ময়দায় পরিণত করছে।
ময়দা গিয়ে পড়ছে বস্তায়, আর যাঁতা-চালক বস্তাগুলো বোঝাই করছে ঘোড়ার গাড়িতে। এই-ই হচ্ছে সেই বিখ্যাত জলীয় যাঁতাকল বা ময়দা-কল যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবজাতিকে 'খাদ্য জুগিয়েছে'।

কিংবা এরূপ ব্যাপারও হয়তো লক্ষ্য করেছ। জলীয় চাকা থেকে চলে গেছে মোটা একটি বিম। বিমে দন্তযুক্ত কয়েকটা চাকা। চাকাগুলো ঘোরাচ্ছে তুরপুন (বা ড্রিল), হাতুড়ি তুলছে কিংবা কামারে ভস্ত্রা ফুলাচ্ছে। ও হচ্ছে কলঘর, মেকানিকেল ওয়ার্কশপ।

ময়দা-কলে শস্য চূর্ণ করা হত। কলঘরে তৈরি করা হত জাহাজের জন্য নোঙর অথবা ঘোড়ার নাল। এই সমস্ত 'প্রতিষ্ঠানে' বিভিন্ন ধরনের কাজ চলত, এবং ওখানে কাজ করত বিভিন্ন ধরনের মেশিন। তবে কাজের জন্য শক্তি তারা পেত একটি উৎস থেকে। ওই উৎসটি হচ্ছে জল।

জলের শক্তি গতিতে। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন বদ্ধ জলে কিন্তু কোন চাকাই ঘুরবে না।

তবে এ ব্যাপারটি সবাই সব সময় বুঝে নি। মধ্য যুগে ভেনিস নগরীতে এমনকি বিশেষ একটি পুকুরও ছিল যেখানে আয়োজিত হত যন্ত্রবিদদের প্রতিযোগিতা। তাঁরা অচল জলকে কাজ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করতেন। বলাই বাহুল্য, তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত। উদ্ভাবকরা নিজেদের অকৃতকার্যতার বিভিন্ন কারণ দর্শাতেন। কেউ কেউ বলতেন, জল ছিল অত্যধিক ঠাণ্ডা, কেউ কেউ বলতেন, সূর্য অত্যধিক গরম। কিন্তু আসল কারণটি ছিল অন্যত্র: জল যে একেবারেই বইছিল না...

তা কোথা থেকে এবং কোথায় বইছে আমাদের নদনদীগুলো? ওগুলো উপর থেকে নিচের দিকে বইছে। পাহাড়-পর্বত থেকে

নিম্নভূমিতে, আর শেষ পর্যন্ত সমুদ্র অভিমুখে। নদীগুলোকে কী চলতে বাধ্য করছে? কোন্ শক্তি এই বিশাল জলরাশিকে নিয়ে যাচ্ছে শত শত হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, সাগর-মহাসাগরের দিকে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা আছে। সে হচ্ছে অভিকর্ষ শক্তি। গ্লাস থেকে পড়া জল তো হামেশাই মেঝের উপর দেখা যায়।

কিন্তু যে-জল নিজে কেবল উপর থেকে নিচের দিকে বইতে পারে তা পাহাড়ের উপরে উঠে কীভাবে? তাকে কোন্ শক্তিশালী পাম্প ওখানে 'তুলে দেয়'? সেই পাম্প হচ্ছে সূর্য।

সূর্য-রশ্মি তপ্ত করে কেবল পাথর, বালু আর উদ্ভিদই নয়। তা গরম করে হ্রদ, সাগর আর মহাসাগরের জলও। জলীয় বাষ্প উঠে অনেক উঁচে, বায়ুমণ্ডলে এবং তা প্রতি মিনিটে সঙ্গে নিয়ে যায় শত কোটি টন জল। বাষ্প যখন শীতল বায়ু স্তরে পেঁৗছে তখন তা আবার জলে পরিণত হয়। সেই জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটতে থাকে এবং বৃষ্টি কিংবা তুষারের আকারে তার উপরিভাগে বর্ষিত হয়। পৃথিবীতে তা নদীনালার সৃষ্টি করে, যা ফের খরবেগে অথবা মন্থর গতিতে জল বয়ে নিয়ে যায় সমুদ্র অভিমুখে। এই প্রক্রিয়ার আর শেষ নেই...

এই মহান গতিটিকে বলা হয় প্রকৃতির জলাবর্ত।

হাজার হাজার বছর আগেকার মতো জল আজও মানুষের সেবা করছে। এটা সত্যি যে তা এখন কেবল শস্য পেষণ করছে না কিংবা কামারশালার হাপরে স্রেফ আগুনই জমকিয়ে তুলছে না। তার প্রধান কাজ — বিদ্যুৎ উৎপাদন।

নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। বাঁধে রাখা হয় বিশাল দ্বারযুক্ত কয়েকটি পাইপ। প্রতিটি পাইপে স্থাপিত হয় ব্লেডযুক্ত চাকা — অর্থাৎ ঔদক (হাইড্রোলিক) টার্বাইন, অথবা সহজ ভাষায়, জল-চালিত টার্বাইন। বিম টার্বাইনকে যুক্ত করে বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সঙ্গে।

জল বাঁধে বাধা পেয়ে ফুলতে শুরু করে। তা যতই বেশি উপরে উঠতে থাকে, তাতে ততই অধিক শক্তি সঞ্চিত হয়। যখন পাইপের দ্বার খোলা হয়, জল টার্বাইনের দিকে ছুটে এবং বিপুল চাপের সঙ্গে তার ব্লেডে আঘাত করে। টার্বাইন পাক খেতে আরম্ভ করে। তার সঙ্গে পাক খায় বৈদ্যুতিক জেনারেটর এবং তা বিদ্যুৎ প্রস্তুত করে।

বাঁধ, টার্বাইন আর জেনারেটর — এগুলো একসঙ্গে মিলে গঠন করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে বহু জলপূর্ণ শক্তিশালী নদী। দেশের ইউরোপীয় অংশের সমস্ত বড় বড় নদী—ভোলগা, নীপার, কামা—ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ভোলগার উপর পর পর অনেকগুলো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। নীপারের উপরও বহু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

তবে সাইবেরীয় নদীগুলোতে অব্যবহৃত শক্তি এখনও প্রচুর। সেই জন্যই ওখানে নির্মিত হচ্ছে নদীগুলোরই মতো ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়া হয়েছে ক্রাস্নয়ার্স্কের কাছে ইয়েনিসেই নদীর উপরে। ওখানেই, ইয়েনিসেইয়ের উপরে, এখন নির্মিত হচ্ছে আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন সায়ানো-শুশেনস্কায়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। তার জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছে গভীর এক গিরিখাতে, যার তীরগুলো উ'চু। ইয়েনিসেইয়ে তোলা হয়েছে কংক্রিটের উচ্চ বাঁধ। বাঁধে স্থাপিত হবে দশটি হাইড্রো-ইউনিট। বৈদ্যুতিক জেনারেটর সমেত হাইড্রো-টার্বাইনকে এই নামেই অভিহিত করা হয়।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় অনেক। তবে তাতে উৎপাদিত শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা। কারণ তার উৎস হচ্ছে — 'মোফতের' সূর্য। তোমার মনে আছে, আমরা সৌর 'পাম্পের' কথা বলেছিলাম?

কিন্তু দেখা গেল যে জলকে নিজ শক্তি দেয় কেবল সূর্যই নয়। আমাদের 'রাতের জ্যোতিষ্ক' চাঁদও ওই একই কাজ করে থাকে। না, তা জল গরম করে না এবং বায়ুমণ্ডলেও বাষ্প তুলে না। তা কাজ করে নিজের চান্দ্র আকর্ষণের দ্বারা।

সবারই জানা আছে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ শক্তি নির্ভর করে বস্তুর ওজনের উপর, আর সঠিকভাবে বললে, বস্তুর ভরের উপর। ভর যত বেশি, বস্তু ততই বেশি জোরে চারিপাশের সমস্তকিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুগুলোর মধ্যে ব্যবধান যত বেশি, তাদের আকর্ষণ শক্তি ততই কম। তা যতই পরস্পরের কাছে থাকবে আকর্ষণও ততই প্রবল হবে।

চাঁদ হচ্ছে আমাদের নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী। তা পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর সমস্তকিছুকে বেশ জোরেই নিজের দিকে 'টানে'। চাঁদ কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানের উপর ঝুলছে না, তা সর্বদাই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। তার কক্ষপথের নিচে যাকিছুই

থাকে তা সে একটু উপরে 'তুলে'। স্থলভাগে তা দৃষ্টির অগোচর। তবে সাগর-মহাসাগরের বুকে সৃষ্টি হয় তরঙ্গ, এবং তা খুবই দৃষ্টিগোচর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার নির্দিষ্ট এক সময়ে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সমস্ত সাগর আর মহাসাগরের উপর দিয়ে ছুটে সে ঢেউ। বিপুল জলরাশি মন্থর গতিতে উঠা-নামা করতে থাকে, আর তীরের কাছে কখনও সৃষ্টি হয় জোয়ার, কখনও ভাটা।

'চান্দ্র' তরঙ্গগুলোতে থাকে প্রচুর শক্তি। পৃথিবীর সমস্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র যে-পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তার চেয়ে শতগুণ বেশি। অবশ্য সাগর-মহাসাগরের বিস্তীর্ণ বক্ষে ছড়িয়ে থাকা এই শক্তিকে ধরা অসম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে তো আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া যায় না। তবে কিছুটা শক্তি তবুও ধরা সম্ভব হচ্ছে।

শক্তি 'ধরা হয়' এভাবে। খুঁজে বার করা হয় একটি খাড়ি, যার প্রবেশ-পথটি সঙ্কীর্ণ। পথটি বাঁধ দিয়ে বন্ধ ক'রে তাতে স্থাপন করা হয় টার্বাইন আর জেনারেটর। জোয়ার ও ভাটার সময় পাইপের মাধ্যমে জল এসে টার্বাইনগুলো ঘুরাতে থাকে।

সাধারণত জল উঠে তিন-চার মিটার উপরে। কিন্তু এমনও জায়গা আছে যেখানে জোয়ারের ঢেউয়ের উচ্চতা হয় এক-একটা দালানের সমান। আর তরঙ্গ যত বেশি উচ্চ, জল ততই বেশি জোরে টার্বাইনের ব্লেডগুলোতে আঘাত করে — এবং তার মানে ওগুলোকে বেশি শক্তিও দেয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ওখোৎস্ক সাগরের উত্তর 'কোণে,' যেখানে পতিত হচ্ছে পেন্‌জিনা নদী, ক্রাস্নয়ার্স্ক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে তিনগুণ অধিক শক্তিশালী একটি জোয়ার স্টেশন নির্মাণ করা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সে সাগর-মহাসাগরের উপকূলে ইতিমধ্যেই প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দেখা দিয়েছে। কোলা উপদ্বীপের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ক্ষমতা অবশ্য বেশি নয়। তবে সোভিয়েত এঞ্জিনিয়র আর বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে উত্তরের সমুদ্রসমূহের উপকূলে জোয়ার স্টেশনের নতুন নতুন ডিজাইন প্রস্তুত করছেন। তা দেশের উত্তরাঞ্চলকে জোগাবে শক্তি, যার প্রয়োজনীয়তা ওখানে বছরে বছরে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তোমার মনে আছে, আমরা মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিদদের কথা বলেছি যাঁরা বদ্ধ জলকে কাজ করতে বাধ্য করছিলেন? তুমি জান যে

তাঁদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল। তবে অতি সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ভেবে ঠিক করেছেন কীভাবে ও-কাজ করা যেতে পারে।

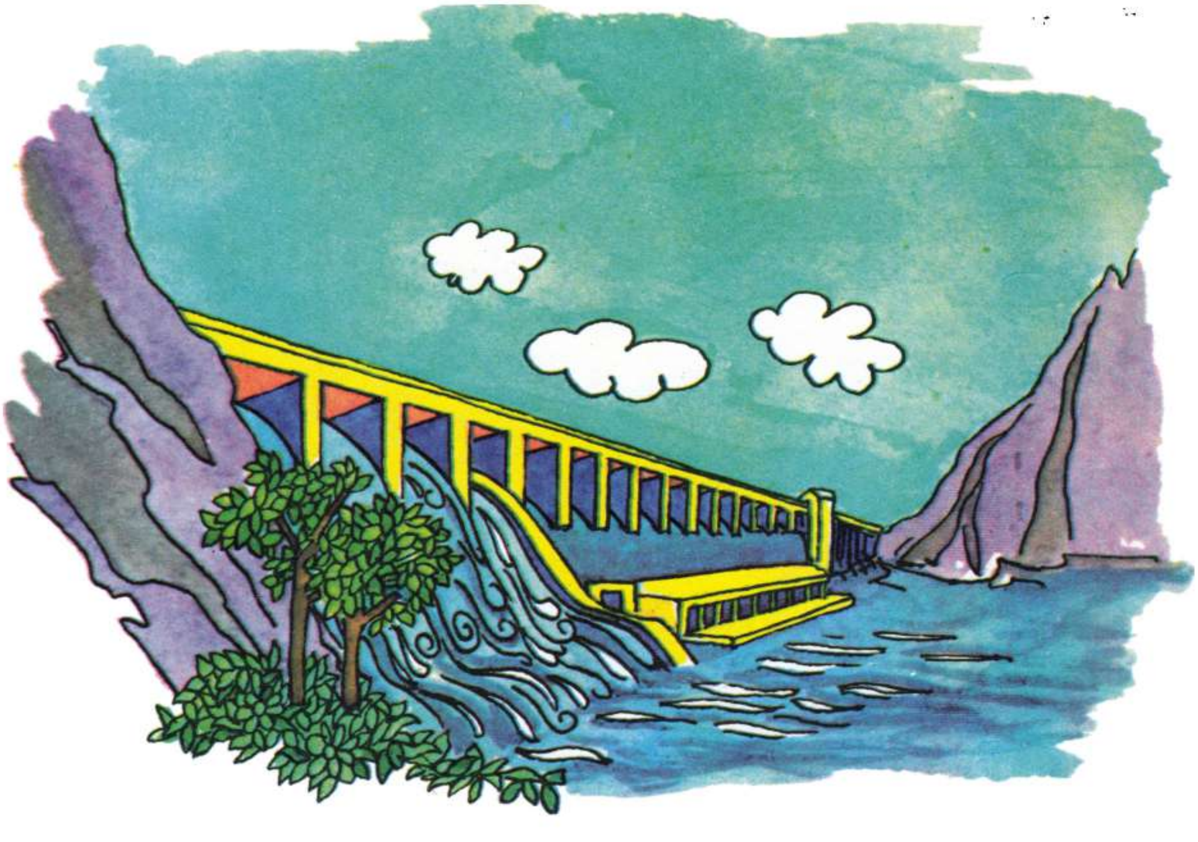
সমুদ্রে কিংবা বৃহৎ হ্রদে গভীর জলের মধ্যে ছাড়া হয় বিশাল একটি সিলিন্ডার। সিলিন্ডারের 'ঢাকনীতে' লাগানো থাকে অর্গলযুক্ত একটি কিংবা কয়েকটি পাইপ। পাইপগুলোর মধ্যে — হাইড্রো-ইউনিট। অর্গলগুলো খুললে পাইপের ভেতর দিয়ে জল যাবে সিলিন্ডারে। যাওয়ার পথে তা টার্বাইনগুলোর মধ্য দিয়েও চলবে এবং ওগুলোকে ঘুরতে বাধ্য করবে। টার্বাইনগুলো ততক্ষণ কাজ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সিলিন্ডারটি পুরোপুরিভাবে জলপূর্ণ না হচ্ছে। এর পর হাইড্রো-ইউনিটগুলো থেমে যাবে।

যদি সব সময় কাজ না করে তাহলে এ ধরনের স্টেশন গড়ে লাভটা কী? লাভ আছে বৈকি। আমরা জানি যে সকালে, যখন কলকারখানাগুলোতে কাজ শুরু হয়, এবং সন্ধ্যায়, যখন জ্বালানো হয় আলো, বাড়িতে বাড়িতে চালানো হয় টেলিভিশন সেট, তখন দরকার হয় প্রচুর শক্তি। আর রাত্রিবেলা শক্তি খরচ হয় খুবই কম।

সকাল ও সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে সমস্ত জেনারেটরই কাজ করে পূর্ণ শক্তিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তিতে কুলোয় না। আর রাত্রিবেলা অধিকাংশ ইউনিটই থামিয়ে দেওয়া হয়। তখন ওগুলোর শক্তিতে কারো প্রয়োজন নেই। এই জল-গর্ভস্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো কঠিন মুহূর্তে স্থলভাগের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকেই সাহায্য করবে। তবে এর জন্য ওগুলোকে দিবাকালীন কাজের জন্য প্রস্তুত করা চাই — সিলিন্ডার থেকে জল বার করা দরকার। সে কাজটি সম্পন্ন হয় বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে রাত্রিবেলা, যখন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে শক্তির কোন অভাব থাকে না। জল-গর্ভস্থ স্টেশনগুলো বিদ্যুৎ শক্তি 'জমা করে রাখবে' আর কি।

তুমি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে খোদ জ্বালানি ও জল শক্তি প্রস্তুত করে না। ওগুলো কেবল সূর্যের শক্তি 'ধরে রাখে'।

তাহলে জ্বালানি আর জল ছাড়া কি চলে না? সরাসরি সূর্যের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করলে কেমন হয়? হ্যাঁ, তাও সম্ভব। এবার সে কথাই বলছি, মন দিয়ে শোনো।











'চিরদিন আলো দিক সূর্য' — এ হচ্ছে শিশুদের গানের একটা কথা। আকাশে যখন সূর্য থাকে, যখন চারিদিকে অনেক আলো ও তাপ, তখন কী ভালোই না লাগে।

সৌর শক্তি — সে হচ্ছে পৃথিবীতে প্রাণের উৎস, সূর্যের তাপে অঙ্কুরোদ্গম হয়, ফল পাকে ও গমে রস দেখা দেয়, বিশাল ও উঁচু গাছগুলো আকাশ 'স্পর্শ করতে' চায়, ঘাসের সবুজ গালিচা আবৃত করে মাটি।

কিন্তু মরুভূমিতে, যেখানে জল নেই, প্রখর সূর্যতাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে বালু, ফাটতে থাকে পাথর। ওখানে সূর্যের সঞ্জীবক শক্তি পরিণত হয় বিনাশী ও অপ্রয়োজনীয় এক শক্তিতে।

'অতিরিক্ত' সৌর শক্তি আছে কেবল মরুভূমিতেই নয়। প্রতিটি সূর্য রশ্মিই তো আর নিজের ঘাস কিংবা পাতা খুঁজে পায় না। রৌদ্র শহরের রাস্তাগুলোর অ্যাসফল্ট আর বাড়ির ছাদ গরম করে। মানুষ বহুকাল আগে থেকেই ভাবছে, কীভাবে এই 'অতিরিক্ত' শক্তিটির সদ্ব্যবহার করা যায়।

তারা গড়ল বিভিন্ন ধরনের অনেক সৌর যন্ত্র। তার মধ্যে সবচেয়ে সাদাসিধেটি হল — বিবর্ধক কাচ বা ম্যাগনিফাইয়িং লেন্স। তুমি নিশ্চয়ই নিজ হাতে তা ধরে থাকবে। ওই কাচ সূর্যালোক সংগ্রহ করে এবং তা থেকে সরু রশ্মির আকারে নিঃসৃত আলোতে জ্বলতে শুরু করে কাঠের টুকরো, কাগজ এবং সময় সময় এমনকি — বলতে আপত্তি নেই — তোমার পেণ্টও। কাচ অর্থাৎ লেন্স যত বড় হবে, সৌর সূচও তত শক্তিশালী হবে। পেণ্ট জ্বালানোর পক্ষে একেবারে ছোট্ট একটি লেন্সই যথেষ্ট। আর রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে কেটলিতে চায়ের জল ফোটানোর জন্য লেন্সটি হতে হবে ট্রাক্টরের চাকার সমান। আর বালতি কিংবা পিপে ভরা জল ফোটানোর জন্য? তার জন্য প্রয়োজন অনেক বড় বড় লেন্স।

এক কথায়, এটা সৌর শক্তি 'ধরার' শ্রেষ্ঠ উপায় নয়।

তুমি সম্ভবত সৌর ব্যাটারির কথা শুনেছ। ওগুলো মহাকাশযানকে শক্তি জোগায়। আর হয়তো বা ছবিতেই তুমি তা দেখেছ। ওগুলো দেখতে কারুকার্য খচিত ঝাঁঝরি-পাখার মতো। এই ব্যাটারি তৈরি করা হয় বিশেষ জিনিস — অর্ধ-পরিবাহী বা সেমি-কণ্ডাক্টর

সামগ্রী দিয়ে। সৌর কণিকার আঘাতে তাতে সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ।

এই বিদ্যুৎ দিয়ে পূর্ণ করা হয় প্রায় মোটর গাড়িরই মতো সাধারণ ব্যাটারিগুলো। এবং মহাকাশযানেও সর্বদা বিদ্যুৎ শক্তি থাকে।

সৌর ব্যাটারিগুলো আপাতত খুব একটা ভালো কাজ করছে না। তা ধৃত সৌর শক্তির কেবল দশমাংশই বিদ্যুতে 'রূপান্তরিত করে'। তাই এই ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় একমাত্র মহাকাশেই যেখানে অন্য উপায়ে শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে সৌর ব্যাটারিগুলো যদি অন্ততপক্ষে তিনগুণ ভালোভাবে কাজ করে, তাহলে তা পৃথিবীতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভবত গড়া হবে মরুভূমিতে। উত্তপ্ত বালুকে ঢেকে দেওয়া হবে বিশাল অর্ধ-পরিবাহী 'কম্বল' দিয়ে। সূর্য রশ্মি তাকে দেবে আপন শক্তি এবং পরিণত হবে বিদ্যুৎ প্রবাহে। স্টেশনে সেই বিদ্যুৎ সংগ্রহ ক'রে পরে তার মাধ্যমে তা সরবরাহ করা হবে বাড়িতে বাড়িতে, কলকারখানায়, স্কুলে...

কিন্তু আমাদের কাছে সূর্য প্রেরিত সমগ্র শক্তি ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছে না। আমাদের গ্রহটি বায়ুমণ্ডলের পুরু স্তর, মেঘ, কলকারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত ছাইভস্ম এবং ধূলিকণা দিয়ে ঢাকা। সেই জন্যই বিজ্ঞানীরা এখন মহাকাশে একটি 'অর্ধ-পরিবাহী' বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়ার চেষ্টা করছেন। ওখানে সৌর রশ্মির জন্য কোন রকমের বাধা নেই। কেন্দ্রটির উৎপাদিত বিদ্যুৎকে পরিণত করা হবে ক্ষমতাসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ (রেডিও ওয়েভ)-এ এবং তা পৃথিবীতে প্রেরিত হবে। আর এখানে এই রশ্মি আবার পরিণত হবে বিদ্যুৎ প্রবাহে।

বিজ্ঞানীরা আরও একটি 'সৌর' ডিজাইন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ওটা তাঁদের 'বাৎলে দিয়েছে' খোদ প্রকৃতিই।

তুমি জান যে উদ্ভিদ আর প্রাণীর জন্য শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য। গাছের পাতা এবং ঘাস প্রচুর পরিমাণ সূর্য রশ্মি সংগ্রহ করে। ওগুলোর শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদের কোষসমূহে এক পদার্থ পরিণত হয় অন্য পদার্থে। ওই সমস্ত পদার্থেই সঞ্চিত হয় শক্তি। তবে তা আর সৌর শক্তি নয়, রাসায়নিক শক্তি। যখন আমরা ভাত ও দুধ খাই আমরা ঠিক ওই শক্তিটাই ব্যবহার করে থাকি। মানুষের জন্য খাদ্যও যে শক্তির উৎস। যেমন সূর্য হচ্ছে উদ্ভিদের জন্য শক্তির উৎস।

জীবন্ত কোষেরা কীভাবে সূর্য রশ্মি ব্যবহার করে তা যদি তাদের কাছে শেখা যেত! আর পরে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়া যেত

জীবন্ত কোষের চেয়ে শতকোটি গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন কৃত্রিম কিছু 'কোষ-কারখানা'।

তাহলে মরুভূমিগুলোতে এবং যেখানেই প্রচুর রৌদ্র আছে সেখানেই দেখা দিতে পারে বিস্ময়কর সব শক্তি ক্ষেত্র। কল্পনা কোরো: দক্ষিণের প্রখর সূর্যতপ্ত মরুভূমির হলদে বালুর উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছে স্বচ্ছ পাইপগুলো। পাইপগুলোর ভেতর দিয়ে বইছে 'জ্যান্ত' অথবা, রসায়নবিদদের ভাষায়, জৈব দ্রবসমূহের নদী। ওই দ্রবসমূহ ঠিক উদ্ভিদের কোষের দ্রবেরই মতো।
দ্রব অনেক সূর্য রশ্মি চুষে নেয়, এবং তার ফলে ওগুলোতে সৃষ্টি হয় রাসায়নিক শক্তি কর্তৃক 'পুর দেওয়া' নতুন কিছু পদার্থ। পাম্পের সাহায্যে দ্রবসমূহ প্রেরিত হয় কলকারখানার কর্মশালায়। ওখানে তা ফিল্‌টারে পরিস্রুত ক'রে শক্তি-সমৃদ্ধ দ্রব্যাদি নিয়ে নেওয়া হয়। 'ফসল' তুলে নিয়ে দ্রবতে প্রয়োজনীয় পদার্থ যোগ করা হয় এবং ফের তাকে পাঠানো হয় শক্তির সন্ধানে।

মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় তাই করে আসছে। তারা মাটিতে বীজ বপন করে, অঙ্কুরের যত্ন নেয় এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে কবে সূর্য রশ্মির প্রভাবে উদ্ভিদ বড় হবে, পেকে উঠবে এবং আপন কোষগুলোতে পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত করবে। উদ্ভিদ তুলে ফেলা হয় এবং ভবিষ্যৎ ফসলের জন্য সংগ্রহ ক'রে রাখা হয় বীজ। আর তার পর খাওয়া হয় গম, যব, টমেটো, আলু, গাজর কিংবা বীট। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, এগুলো থেকে নেওয়া হয় শক্তি-সমৃদ্ধ দ্রব্যসমূহ।

কৃত্রিম 'সৌর' ক্ষেত্রগুলোর জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন। আর পৃথিবীতে এরূপ জায়গার অভাব নেই। তা আছে আফ্রিকায় — বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি, এশিয়ায় — গোবি মরুভূমি, সোভিয়েত ইউনিয়নে — কারাকুম মরুভূমি।

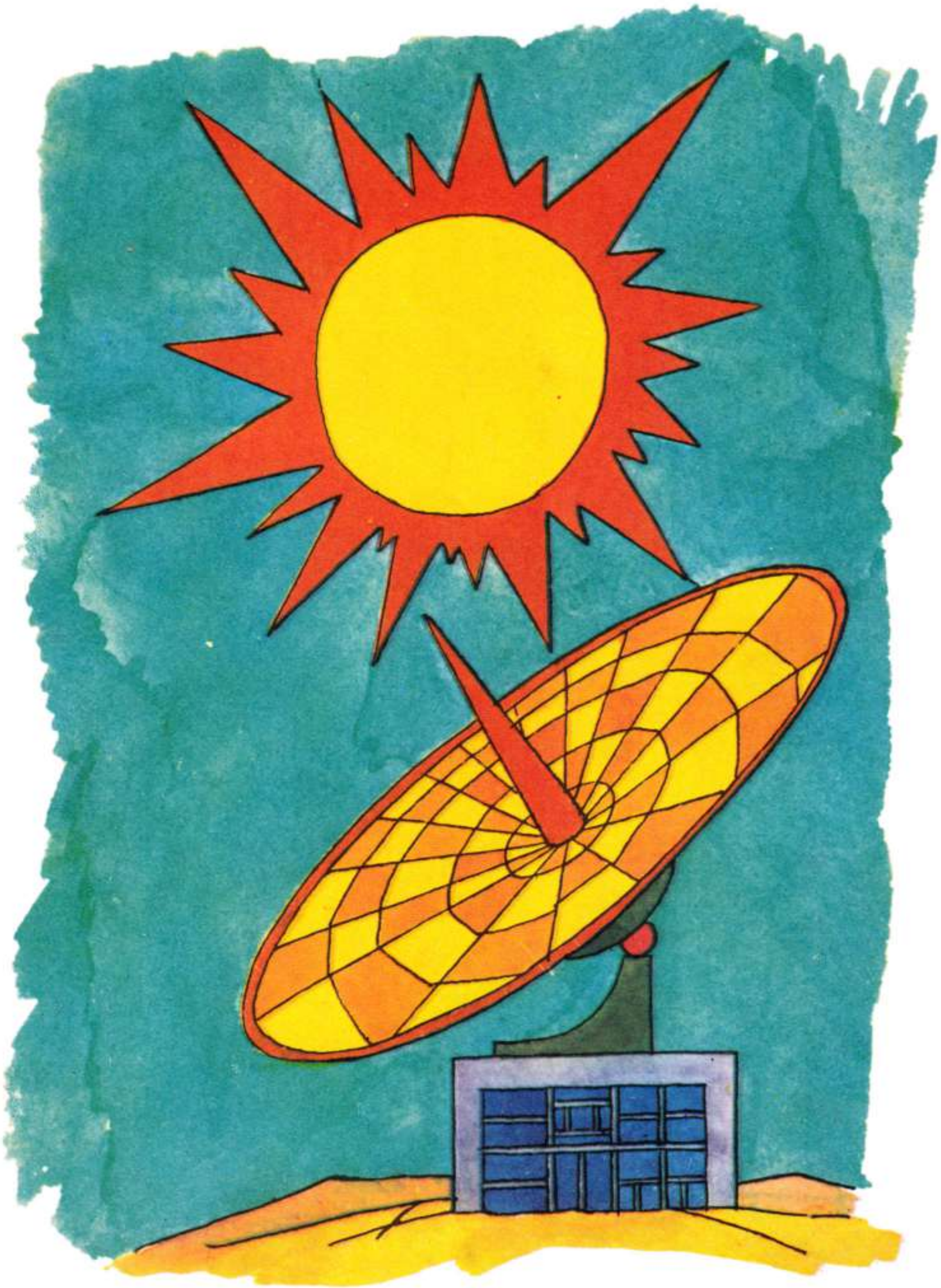
তা এই 'সৌর' ক্ষেত্রগুলো থেকে কি প্রচুর শক্তি মিলবে? হ্যাঁ, প্রচুরই বৈকি — আজ আমাদের দ্বারা নিষ্কাশিত সমগ্র জ্বালানি দিয়ে যে-শক্তি উৎপাদিত হয় তার চেয়ে ষাট গুণ বেশি।

তাছাড়া জ্বালানি ও পারমাণবিক 'খোরাকের' সঙ্গে সঙ্গে সৌর 'খোরাক' ব্যবহৃত হলে তা প্রকৃতির কোন ক্ষতি করবে না। তা বায়ুমণ্ডল, জল ও মাটি দূষিত করবে না।

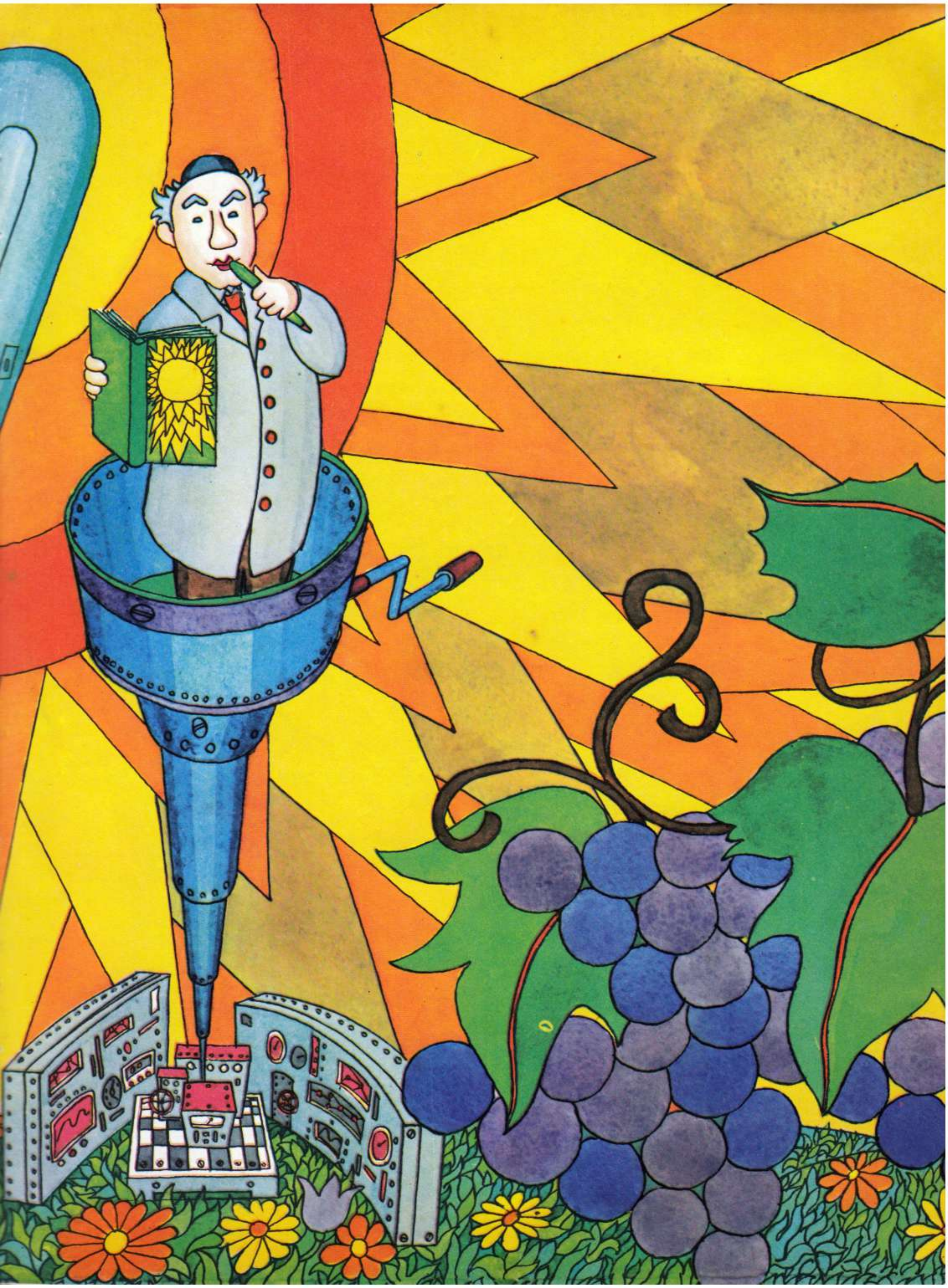
আর গরম জায়গাগুলো থেকে ঠাণ্ডা জায়গাসমূহে শক্তি প্রেরণ ক'রে লোকে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তার ফলে আমাদের গ্রহ বসবাসের পক্ষে আজকের চেয়ে ঢের বেশি আরামজনক হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটি খুবই প্রলোভনজনক, তাই নয় কি? আর হয়তো বা

তুমি ভাবছ এ সবই অলীক কল্পনা? আপাতত অবশ্য কল্পনাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো কাজে লেগে গেছেন। আর তার মানে, সৌর ক্ষেত্র একদিন দেখা দেবেই।




10



বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার — পৃথিবী

মানুষের পক্ষে পৃথিবী থেকে শত শত কিলোমিটার উপরে উঠা সম্ভব হয়েছে। তারা চাঁদে গেছে, মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহে পাঠিয়েছে স্বয়ংক্রিয় স্টেশন। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি হয়তো বা প্রধান রহস্যটি রয়েছে আমাদের পায়ের তলায় — ভূগর্ভে। অথচ ভূগর্ভের গভীরে প্রবেশ করা এখনও সম্ভব হয় নি। কেবল কয়েকটি স্থানে ভূপৃষ্ঠ থেকে ভেতরে তেরো কিলোমিটারের বেশি দৃষ্টিপাত করা গেছে। কিন্তু আরও গভীরে কী হচ্ছে? আর একেবারে কেন্দ্রস্থলে?

পৃথিবী হচ্ছে শক্ত খোসাযুক্ত বাদামের মতো। তার ভেতরে আছে উত্তপ্ত নিউক্লিয়স। ওখানে তাপমাত্রা ব্লাস্ট-ফার্নেসের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি। আর তার মানে সমস্ত পদার্থও গলে আছে। ভূপৃষ্ঠের দিকে যত কাছে পৌঁছা যায়, তাপমাত্রা ততই কম। তবে কুড়ি কিলোমিটার গভীরেও সে তাপমাত্রা অতি উচ্চই থেকে যায় — ৬০০ ডিগ্রি। গলে-যাওয়া পদার্থসমূহ বিপুল শক্তিতে 'খোসার' গায়ে চাপ দেয়, যেন তা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়, এবং ফাটল দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। পথিমধ্যে যদি জল থাকে তা মুহূর্তের মধ্যে ফুটে উঠে, পরিণত হয় বাষ্পে এবং মাটির তলা থেকে বেগে বইতে শুরু করে উষ্ণ প্রস্রবণ।

জল গরম করতে ও ফুটাতে লোকে প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান জ্বালানি খরচ করে। আর এখানে জ্বালানি খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই — উষ্ণ প্রস্রবণগুলোতে কেবল পাইপ বসিয়ে দিলেই হল, জল সরাসরি শহরে ও গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। অনেক জায়গায় ঠিক তা-ই করা হচ্ছে।

তাছাড়া ভূগর্ভস্থ বাষ্প এবং গরম জল সরবরাহ করা হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে। পাইপ দিয়ে বাষ্প যায় টার্বাইনে এবং তা টার্বাইনগুলোকে ঘুরায়, আর ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সাধারণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা হয় ব্যাপারটা প্রায় তারই মতো। তবে এই স্টেশনগুলোতে স্টিম বয়লারের প্রয়োজন নেই। তা আছে মাটির তলায়। এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম হচ্ছে জিওথার্মেল স্টেশন বা ভূ-তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম জিওথার্মেল স্টেশন নির্মিত হয় কামচাৎকায়। ১৯৬৬ সালে তা বিদ্যুৎ ও তাপ দেয় জেলেদের শহর ওজিওর্নায়া-কে। তাপ সরবরাহ করা হয় ঘরবাড়ি আর হট-হাউসগুলোতে, শহরের বাসিন্দারা প্রায় সারা বছর খায় পেঁয়াজ পাতা, পার্স্‌লি আর শসা।

এ ধরনের স্টেশন অন্যান্য দেশেও নির্মিত হচ্ছে। আর সম্প্রতি ফ্রান্সে, প্যারিসের নিকটে গরম জলের একটি হ্রদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এবার বিজ্ঞানীরা ভাবছেন সে জল কোথায় সরবরাহ করলে সবচেয়ে ভালো হয় — প্যারিসবাসীদের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কিংবা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে।

ভূগর্ভস্থ বয়লার ব্যবহার করার জন্য উষ্ণ প্রস্রবণ বা হ্রদ খুঁজে বার করা মোটেই জরুরী নয়। এঞ্জিনিয়াররা 'নিজ হাতে' তা গড়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন।

মাটিতে দুটি ছিদ্র-কূপ খনন করা হয় এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক গভীরে ওগুলোকে ভূগর্ভস্থ খাল দ্বারা যুক্ত করা হয়। একটি ছিদ্র-কূপ দিয়ে ঠাণ্ডা জল ছাড়া হয় উত্তপ্ত স্তরগুলোতে, আর অন্যটি দিয়ে গরম জল ও বাষ্প উপরে উঠতে থাকে। ভূগর্ভস্থ তাপ আছে সর্বত্র, ভূপৃষ্ঠের যেকোন বিন্দুর তলায়। তা আছে মস্কোর তলায়, সাহারায়, তুন্দ্রাঞ্চলে। আর সবাই জানে যে তুন্দ্রায় 'বছরের বারো মাস শীত, বাকি সময় — গ্রীষ্মকাল', এবং ওখানেই ভূ-তাপের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তবে এ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ নিউক্লিয়সে নিহিত শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র। যদি সেই নিউক্লিয়সের নাগাল পাওয়া যেত, তাহলে লোকে বহু হাজার বছর নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারত।

তবে এ কাজটি করা মহাকাশে যাওয়ার চেয়ে অনেক গুণ কঠিন। এখন ভূগর্ভে 'দৃষ্টিপাত করা' যায় কেবল ছিদ্র-কূপের সাহায্যে। ছিদ্র খনন করা হয় বিশাল বিশাল ড্রিল দিয়ে — বোরিং মেশিন দিয়ে। কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যান্ত্রিক দন্তযুক্ত — তুরপুনযুক্ত — ইস্পাতের পাইপ ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে মিটারের পর মিটার ক্রমশই নিচের দিকে নামতে থাকে। তবে অধিক গভীরতায় পাইপের লম্বা স্তম্ভ নিজের ভারেই ভেঙে যায়। ভূগর্ভে সত্যিকার ভ্রমণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কোনকিছু উদ্ভাবন করা দরকার। হয়তো বা বিশেষ জাহাজ — ভূগর্ভযান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভূগর্ভযান নির্মাণ করা হয়েছে কীভাবে জ্যান্ত ছুঁচো কাজ করে তা দেখে। ছুঁচো তার ধারাল দাঁত দিয়ে

মাটি কেটে তুলে এবং পরে মাথা ঘুরিয়ে তা দুরমুশ ক'রে দ্রুত সামনের দিকে এগুতে থাকে।

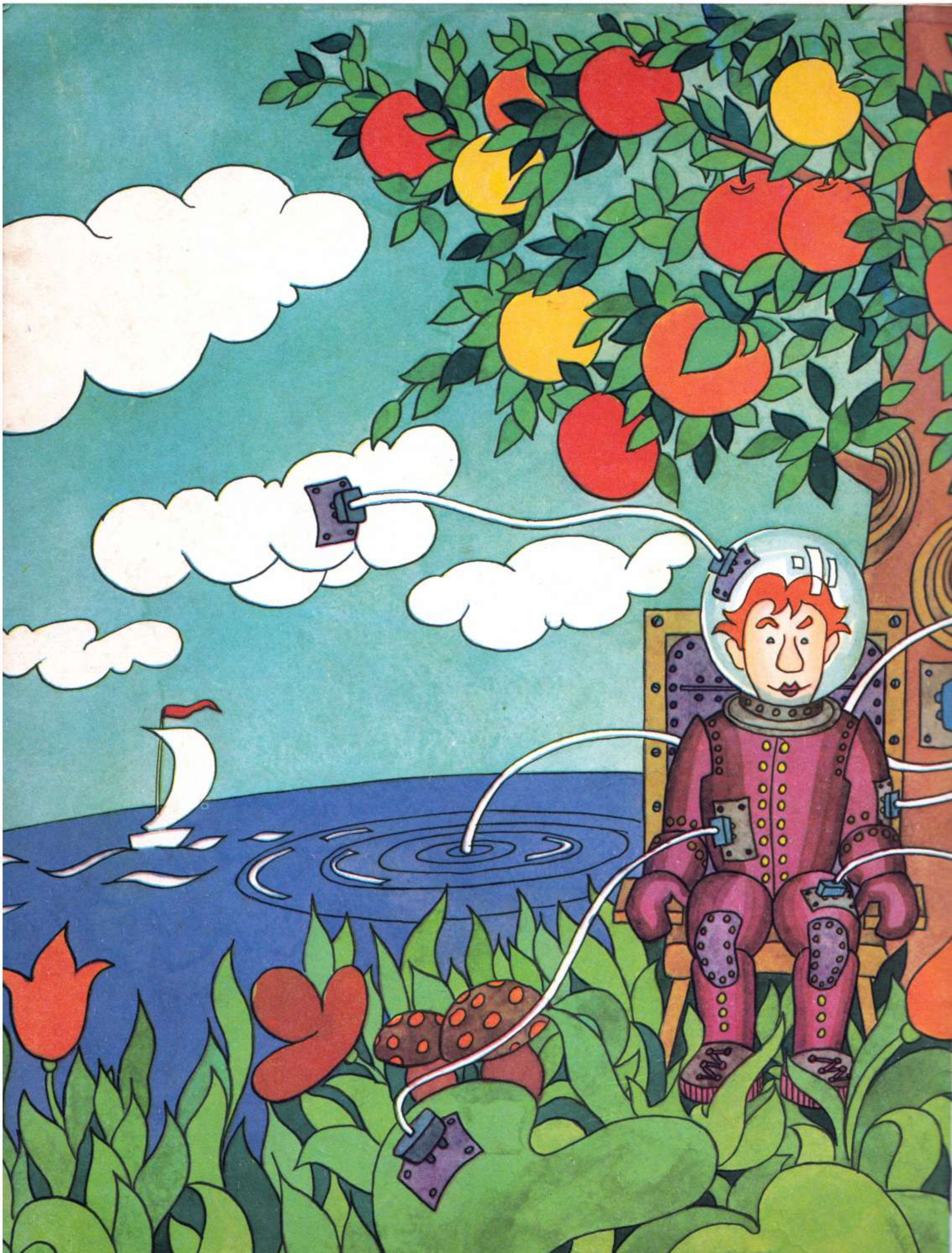
যান্ত্রিক 'ছুঁচো' সজ্জিত হয় শক্ত ধাতব দন্ত, ঘূর্ণ্যমান মজবুত 'গলা' আর বারুদের এঞ্জিন দিয়ে। পরীক্ষার সময় তা প্রবেশ করে খুব গভীরে — সাত কিলোমিটার গভীরে।

তাই এটা খুবই সম্ভব যে একদিন কল্পকাহিনীতে নয়, সংবাদপত্রে আমরা ভূগর্ভযানে ক'রে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পরিচালিত অভিযানের খবর পড়তে পারব।











তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ যে প্রায় প্রতিটি গল্পেই আমরা বিদ্যুতের কথা স্মরণ করছি। তাপ শক্তি, পারমাণবিক শক্তি কিংবা জলীয় শক্তি — এগুলোর বিষয়ে বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথাও উল্লেখ করব।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মানুষ এক-তৃতীয়াংশ তাপ শক্তি ব্যয় করে। আমাদের দ্বারা নদীগুলো থেকে গৃহীত সমস্ত শক্তি পরিণত হয় বিদ্যুতে। বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত অবস্থায় পারমাণবিক শক্তিতেও আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। এবং এ সব মোটেই আপতিক ব্যাপার নয়।

বিদ্যুৎ হচ্ছে শক্তির সবচেয়ে 'নিপুণ' রূপ। তা সমস্তকিছু কিংবা প্রায় সমস্তকিছু করতে পারে।

আমাদের শতাব্দীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। পারমাণবিক যুগ, রকেটের যুগ, মহাজাগতিক যুগ। তবে সবচেয়ে সঠিক নামটি হচ্ছে বিদ্যুতের যুগ। তা আগেও ছিল এবং এখনও রয়েছে।

এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। চারিদিকে তাকালেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের বাড়িতে আছে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার, টেলিভিশন, রেডিও, লিফ্‌ট্‌, দাড়ি কামানোর ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্র, জ্বলছে বৈদ্যুতিক আলো। রাস্তায় চলছে ট্রাম. ট্রলিবাস। রেলপথে — ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন। মাটির তলায় আছে ভূগর্ভ রেল। বিদ্যুৎ — এ হচ্ছে কলকারখানার কোটি কোটি এঞ্জিন, কম্পিউটার যন্ত্র। বিদ্যুৎ না থাকলে আমাদের জীবনযাত্রা শতগুণ কঠিন হয়ে উঠত।

প্রকৃতিতে দরকারী বিদ্যুৎ নেই। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘের গর্জন শোনা যায়। কিন্তু তাতে আমাদের কোন উপকার হয় না। প্রকৃতিতে কয়লা, তেল কিংবা জলশক্তির মতো বিদ্যুতের কোন ভান্ডার নেই. তা 'প্রস্তুত আকারে' পাওয়া যায় না। বিদ্যুতের স্রষ্টা হচ্ছে মানুষ। বিদ্যুতের উৎপত্তির উৎসে রয়েছে মানব মেধা।

এরূপ একটি গল্প শোনা যায়। অনেক অনেক কাল আগে অধ্যাপক লুইজি গালভানি তাঁর নিজের বাড়িতে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অধ্যাপকের স্ত্রী ফায়ার প্লেসের কাছে বসে ইস্পাতের একখানি ছুরি দিয়ে বেঙের চামড়া ছাড়াচ্ছিলেন। ওই বেঙগুলো সে সন্ধ্যায় ভাজা করার কথা ছিল। শ্রীমতী গালভানি পরিষ্কার ক'রে বেঙগুলো একখানি টিনের

থালায় রাখছিলেন। স্বামী কী বলছিলেন সেদিকে মনোযোগ থাকায় হঠাৎ ছুরিখানি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। ছুরি পড়ল চামড়া-ছাড়ানো একটি বেঙের ঠ্যাঙে এবং তার একটি অংশ থালাটি স্পর্শ করল। ঠ্যাঙটি এমনভাবে নড়ে উঠল যেন মরা বেঙটি থালা থেকে লাফ দিতে চাইছিল। শ্রীমতী গালভানি স্বামীকে ঘটনাটির কথা বললেন। অধ্যাপক বহুবার ঠ্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন যে তিনি 'প্রাণী বিদ্যুৎ' আবিষ্কার করেছেন। গালভানি মনে করতেন যে ওই বিদ্যুৎ জীবদেহে দেখা দিয়ে পেশী এবং মস্তিষ্কের কাজ পরিচালনা করে।

কিন্তু সঠিকভাবে এই রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করেন বিখ্যাত পদার্থবিদ আলেসান্দ্রো ভোল্টা। তিনি 'প্রাণী বিদ্যুতে' বিশ্বাস করতেন না এবং মনে করতেন যে অধ্যাপক গালভানির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেঙের কোন ভূমিকা নেই। ভোল্টা যুক্তি দেখান যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দুই ধাতু—ইস্পাত ও টিনের সংস্পর্শের ফলে। আর ঠ্যাঙটি ছিল স্রেফ পরিবাহী। সাধারণ তামার তারেরই মতো। নয় বছর বাদে ভোল্টা ব্যাপারটি কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ ক'রে দেখান। তিনি তামা ও দস্তার প্লেট দিয়ে গড়েন বিদ্যুৎ প্রবাহের উৎস — ভোল্টা স্তম্ভ বা ভোল্টা পোস্ট, এবং গালভানির সম্মানে তার নাম রাখেন গালভানির উপাদান।

বহু বছর ধরে এই সমস্ত উপাদান বিজ্ঞানীদের বিদ্যুতের রহস্য অধ্যয়নে সাহায্য করেছে। তা বিদ্যুৎ প্রবাহ জোগায় প্রথম বৈদ্যুতিক চুম্বকগুলোকে। ওগুলো থেকে রুশ পদার্থবিদ ভাসিলি পেত্রভ জ্বালান আলোর প্রথম বৈদ্যুতিক উৎস — ভোল্টা ধনু।

কিন্তু ভোল্টার উপাদানসমূহ ছিল খুবই দুর্বল। যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য প্লেট দিয়ে নির্মাণ করা হত উচ্চ ও বিশাল সব মিনার। সেই জন্যই ওগুলোর নাম রাখা হয় স্তম্ভ।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে লন্ডনের এক পুস্তক বাঁধাই কর্মশালার মালিক চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলেকে শিক্ষানবীসিতে নিলেন। সে ছিল দরিদ্র কামারের সন্তান, এমনকি প্রাথমিক স্কুলও শেষ করে নি। কিন্তু ছেলেটি ছিল খুবই কৌতূহলী এবং বই পড়তে ভালোবাসত। তার নাম ছিল মাইকেল ফ্যারাডে। একদিন বৃহৎ বৃটিশ বিশ্বকোষের একটি খন্ড বাঁধাই করার সময় তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পড়েন। বিদ্যুতের বিস্ময়কর গুণাবলি বিষয়ক গল্পটি পড়ে মাইকেল তো অবাক। পুরনো লোহা এবং তারের টুকরোটাকরা জড় ক'রে তিনি নানা রকমের বৈদ্যুতিক যন্ত্র গড়তে ও ওগুলোর সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে শুরু করলেন।

ফ্যারাডে জানতে পারলেন যে বিদ্যুৎ প্রবাহযুক্ত পরিবাহীর

চারিদিকে সর্বদা সৃষ্টি হয় চুম্বক ক্ষেত্র। লৌহচূর্ণের চক্রগুলোর কথা তোমার মনে আছে? ব্যাপারটি অবিকল ওই রকম। 'বিদ্যুৎ পরিণত হয় চুম্বকত্বে!' তখন লেখা হয় বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায়।

ফ্যারাডে ভাবলেন, বিদ্যুৎ যদি চুম্বকত্বে রূপান্তরিত হতে পারে, তাহলে চুম্বকত্বকে বিদ্যুতে পরিণতকরণের চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? আর সব সময় ওই কথাটি যাতে মনে থাকে সেই উদ্দেশ্যে তিনি শার্টের পকেটে দুটি চুম্বক রাখলেন। ফ্যারাডে শত শত পরীক্ষা চালালেন, অনেকগুলো যন্ত্র তৈরি করলেন। অবশেষে, নয় বছরের পরিশ্রমের পর ১৮৩১ সালে, এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হল একখানি ছবি। দুই চুম্বকের মাঝখানে তামার পাতলা একখানি চাক্‌তি। পাশেই চুম্বকের কাঁটা। চাক্‌তি ঘুরলে চুম্বকের কাঁটাটিও ঘুরে। চাক্‌তি থামলে কাঁটা প্রাথমিক অবস্থানে চলে যায়। ফ্যারাডে ব্যাখ্যা করেন যে চাক্‌তির ঘূর্ণনের সময় চুম্বকগুলো তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে 'চুম্বকত্ব', এবং কাঁটা সরে যায়। 'ঘূর্ণনের সময়' ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছ তো? ঘূর্ণন ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় না। এখন আমরা এ বিষয়ে এই ভাবে বলি: গতির যান্ত্রিক শক্তি পরিণত হয় বিদ্যুতে।

ফ্যারাডের যন্ত্রটি সেই নামই পেল: ইলেক্‌ট্রমেকানিকেল জেনারেটর। অর্থাৎ যে-যন্ত্রটি যান্ত্রিক শক্তি থেকে 'প্রস্তুত করে' বৈদ্যুতিক শক্তি। তবে সত্যিকার জেনারেটর নির্মিত হয়েছিল তিরিশ বছর পরে। কিন্তু এটা ঠিক যে ফ্যারাডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক শক্তি-বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। আজ প্রায় সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ইলেক্‌ট্রমেকানিকেল জেনারেটর। ওগুলোর বিভিন্ন নাম। জেনারেটর যদি বাষ্পীয় টার্বাইনের সাহায্যে ঘুরে, তাহলে তাকে বলা হয় টার্বোজেনারেটর। তাকে যদি জলীয় টার্বাইন ঘুরায়, তাহলে তার নাম হয় হাইড্রোজেনারেটর। কিন্তু এতে আসল কাজে কোন বাধা পড়ে না। সত্যি যে আধুনিক জেনারেটরগুলোতে ফ্যারাডের যন্ত্রের মতো তামার চাক্‌তি নেই। ওখানে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় চুম্বক ক্ষেত্রে ঘূর্ণ্যমান তামার তারে।

ফ্যারাডের আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে, ১৮৩৮ সালে, রুশ বিজ্ঞানী বরিস ইয়াকবি উদ্ভাবন করেন প্রথম ইলেক্‌ট্রিক মোটর। ইলেক্‌ট্রিক মোটর সব কাজ করে যেন ঠিক উল্টোভাবে। বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্তিকে তা রূপান্তরিত করে গতিতে। ইয়াকবি তাঁর মোটরটি স্থাপন করলেন নৌকোয় (যা পরে 'ইয়াকবির ইলেক্‌ট্রিক বোট' নামে অভিহিত হয়) এবং নেভা নদীতে তা চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন। তখন সংবাদপত্রগুলো লিখেছিল: '...বারো জন লোক

সমেত ইলেক্ট্রমেকানিকেল শক্তি চালিত একখানি বোট... কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রবল প্রতিকূল হাওয়ার মধ্যে স্রোতের বিপরীত দিকে চলছিল...'

এই দুই আবিষ্কারের সময় থেকেই বৈদ্যুতিক যুগ গণনা শুরু করা যেতে পারে।

নতুন সমস্তকিছুর মতোই বিদ্যুত সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি পায় নি। তাতে মানুষের বিশ্বাস গড়ে উঠে একমাত্র তখন, যখন প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় জ্বলতে শুরু করে 'রুশ আলো' — ইয়াব্লচকোভের ল্যাম্প (১৮৭৬ সাল)।

বিদ্যুৎ জিনিসটা তাহলে কী? পাঠ্য পুস্তকে লেখা আছে, বিদ্যুৎ প্রবাহ — এ হচ্ছে ইলেক্ট্রনের প্রবাহ। তোমার মনে আছে, পরমাণু কীভাবে গঠিত? কেন্দ্রে নিউক্লিয়স, যার চারিদিকে যেন বাঁধা অবস্থায় ঘুরে ঘুরে উড়ছে ইলেক্ট্রনগুলো। তবে দেখা গেল যে ইলেক্ট্রনগুলো নিউক্লিয়সের সঙ্গে সমানভাবে 'বাঁধা' নয়। কোন-কোনটি জোরে 'বাঁধা', আর কোন-কোনটি ঢিলেভাবে। এই 'ঢিলেভাবে বাঁধা' ইলেক্ট্রনগুলোই সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ প্রবাহ। তারা অনায়াসেই আপন পরমাণু ছেড়ে ভ্রমণকারী হতে পারে। বিশেষত ধাতুগুলোতে এ ধরনের মুক্ত ইলেক্ট্রন আছে অনেক, — ওখানে তা বিচরণ করে একেবারে শৃঙ্খলাহীনভাবে। কখনও তারা ঢুকে পড়ে পরের বাড়িতে — পরমাণুতে, কখনও ফের বেরিয়ে পড়ে পথে। তবে ইলেক্ট্রনের এরূপ বিশৃঙ্খল গতির দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় না। বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখা দেয় একমাত্র তখনই যখন সমস্ত স্বাধীন ইলেক্ট্রন মিলেমিশে একই দিকে যাত্রা শুরু করে। অনেকটা একমুখী রাস্তায় চলাচলকারী মোটর গাড়ির মতো। মোটর গাড়ি চালায় ড্রাইভাররা। আর ইলেক্ট্রমেকানিকেল জেনারেটরের তারের মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলোকে চালায় চুম্বক। চুম্বকই সমস্ত ইলেক্ট্রনকে একই দিকে চলতে বাধ্য করে।

বিদ্যুৎ মানুষের জীবনে সত্যিকার বিপ্লব ঘটিয়েছে।

কলকারখানায় এখন বাষ্পীয় মেশিনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওগুলোর স্থান নিয়েছে ইলেক্ট্রিক মোটর। বৈদ্যুতিক তার জোগায় শক্তি, আর ইলেক্ট্রিক মোটর তা পরিণত করে গতিতে। এই মোটর অবশ্য যানবাহনে ব্যবহৃত পেট্রলের মোটরকে 'সাবাড় করতে পারে নি'। বিমান অথবা মোটর গাড়ি নিজের পেছন পেছন তো আর বৈদ্যুতিক তার টানতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যানবাহনের ক্ষেত্রে একটি উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। রেলপথ আর সড়কের উপর দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হল বৈদ্যুতিক তার। ট্রেন, ট্রাম আর ট্রলিবাসের ছাদে

স্থাপিত হল বিদ্যুৎগ্রাহী দণ্ড। বৈদ্যুতিক জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয় তার দিয়ে, তার ঘষে ঘষে যায় বিদ্যুৎগ্রাহী দণ্ড (ধনু) এবং মোটর ঘুরায় চাকা।

বিদ্যুৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী কী পরিবর্তন এনেছে সে কথা আর না-ই বা বললাম। তুমি নিজেই বলো: বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আমরা কি বাঁচতে পারতাম? অথবা টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, লিফ্‌ট্‌, টেলিফোন ইত্যাদি ছাড়া আমাদের কী দশা হত? বাঁচতে অবশ্যই পারতাম। তবে জীবন হত ঢের কষ্টকর ও আনন্দহীন। সিনেমা দেখা হত না, রেডিও শুনতে পারতাম না।

তবে আসল ব্যাপার সিনেমা দেখায় নয়। বিদ্যুৎ — এ হচ্ছে আমাদের শিল্পের প্রধান শক্তি।

বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য লোকে তিনটি 'চেন' ব্যবহার করে থাকে।

সর্বপ্রধান চেনটি হচ্ছে — জ্বালানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আজ এর সাহায্যে পাওয়া যাচ্ছে সমগ্র বিদ্যুতের দশ ভাগের নয় ভাগ। দ্বিতীয় স্থানে — জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। তারা জোগায় প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ বিদ্যুৎ শক্তি। শেষ স্থানে — পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো।

তবে তার মানে এ নয় যে সর্বদাই অবস্থা এরূপ থাকবে। বিশ-তিরিশ বছর বাদেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন করবে অর্ধেক বিজলী। লোকে জ্বালানি বাঁচাবে, এখনই তার পরিমাণ তেমন বেশি নয়। আর বছর পঞ্চাশ পরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র একেবারে বিরল বস্তুতে পরিণত হবে। যেমনটি আজ লক্ষ্য করা যায় বাষ্পীয় রেল এঞ্জিনের ক্ষেত্রে।

স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ বয়ে যায় নদীর মতো। বিদ্যুতের আছে নদীরই মতো গতিপথ — বৈদ্যুতিক তার। সত্যিকার নদীর মতো তারও আছে উৎস — বৈদ্যুতিক জেনারেটর। নদীর মতো বিদ্যুৎও শক্তির অধিকারী এবং বিভিন্ন ধরনের মেশিনকে কাজ করতে বাধ্য করে, যেমন ময়দা কল, হাতুড়ি, লেদ্‌ যন্ত্র ইত্যাদিকে। প্রকৃত নদী গঠিত হয় হাজার হাজার নালা ও জলধারা নিয়ে। আর বিদ্যুৎ প্রবাহ ঠিক তার উল্টো, তা ভেঙে বিভক্ত হয় 'নদীতে, নালাতে ও জলধারাতে'। প্রথমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পরিবহন লাইনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে ক্ষমতাসম্পন্ন 'জলপূর্ণ' প্রবাহ। উঁচু উঁচু খুঁটির উপর এই ধরনের লাইন তুমি সম্ভবত দেখেছ শহরের উপকণ্ঠে, বনে, মাঠে। পরে প্রবাহ বিভক্ত হয় সাব-স্টেশনে। তার একটি অংশ চলে যায় শহরের দিকে, অন্যটি — গ্রাম ও বস্তির অভিমুখে। শহরে প্রবাহ আবার বিভক্ত হয় আঞ্চলিক প্রবাহগুলোতে। আঞ্চলিকগুলো —

কলকারখানা আর রাস্তাঘাটের প্রবাহে। এই ভাবে তা চলতে থাকে মেশিনের মোটর, টেলিভিশন এবং এমনকি সবচেয়ে ছোট টেবিল ল্যাম্পটি অবধি। ভ্রমণের শেষে বিদ্যুৎ পরিণত হয় আলোতে, সিনেমার ছবিতে, ড্রিলের গতিতে, বৈদ্যুতিক উনুনের কিংবা বৈদ্যুতিক ঢালাই চুল্লীর তাপে।

বিদ্যুৎ কী জিনিস লোকে তা ভালোই জানে। কিন্তু তারা তার দোষত্রুটি সম্পর্কেও অবগত। প্রথমত, বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায়টি মানুষের পছন্দ নয়। 'চেনগুলো' ভীষণ লম্বা। বিশেষত সেই ক্ষেত্রগুলোতে, যেখানে তাপ পরিণত হয় বিদ্যুতে।

বিদ্যুৎ হওয়ার আগে কত বার শক্তিকে 'তার সাজ বদলাতে হয়'! প্রথমে জ্বলে জ্বালানি এবং উৎপাদিত হয় তাপ। পরে বাষ্পীয় বয়লারে জল ফুটিয়ে তৈরি করা হয় বাষ্প। বাষ্পের চাপকে পরিণত করা হয় গতিতে। এবং কেবল এর পরই বিদ্যুতের আবির্ভাব ঘটে। শ' বছর আগে এবং আজও 'চেন' সেই একই রয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ পথে প্রচুর শক্তি নষ্ট হয়। এ হচ্ছে মানবজাতি এবং প্রকৃতির পক্ষে অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। প্রতি দ্বিতীয় টন জ্বালানি আমরা নিষ্কাশন করি অনর্থকভাবে জ্বালানোর জন্য, কেবল 'হাওয়া গরম করার' উদ্দেশ্যে। তাপ মেশিনগুলো এখন যা করছে তার চেয়ে আর বেশি ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ররা ভেবে দেখলেন যে 'চেন' থেকে এই মেশিনগুলো সরিয়ে ফেলাই ভালো। তাপ সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত হোক। তাঁরা গড়লেন নতুন মেশিন — ম্যাগনেটিক হাইড্রো-ডায়ন্যামিক জেনারেটর। 'হাইড্রো' মানে 'জল'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত জেনারেটরে জলের কোন নামগন্ধই নেই। থাকার মধ্যে আছে কেবল উত্তপ্ত গ্যাস — প্লাজমা। আমরা জানি যে তা গঠিত হয় বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত অসংখ্য কণিকা দিয়ে। গ্যাস ছাড়া হয় চুম্বকগুলোর মাঝখান দিয়ে, এই সমস্ত চুম্বক কণিকা 'বাছাই করে'। ইতিবাচক (+) কণিকাগুলো পাঠিয়ে দেয় একদিকে, আর নেতিবাচক (–) কণিকাগুলো অন্যদিকে। কণিকাগুলো জড় হয় দুটি প্লেটে। যদি প্লেটদুটি তার দিয়ে যুক্ত করা যায়, তাহলে সেই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে শুরু করবে। আর তার পর সবকিছুই চলে বরাবরকার মতো। কিন্তু কথায়ই বলে না: 'গল্পে সব শেষ হয় তাড়াতাড়ি...' কার্যক্ষেত্রে সমস্তকিছু ঢের জটিল। বিপুল পরিমাণ গ্যাসকে প্লাজমায় পরিণত করা কঠিন। এর জন্য চাই অতি উচ্চ তাপমাত্রা এবং প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি। এরূপ উত্তাপের মধ্যে মেশিনের অংশাদি আস্ত ও অক্ষত

রাখা মুশকিল। এ ছাড়া আরও বহু জটিলতা রয়েছে। সেই জন্যই এরূপ স্টেশনের সংখ্যা আপাতত খুবই কম।

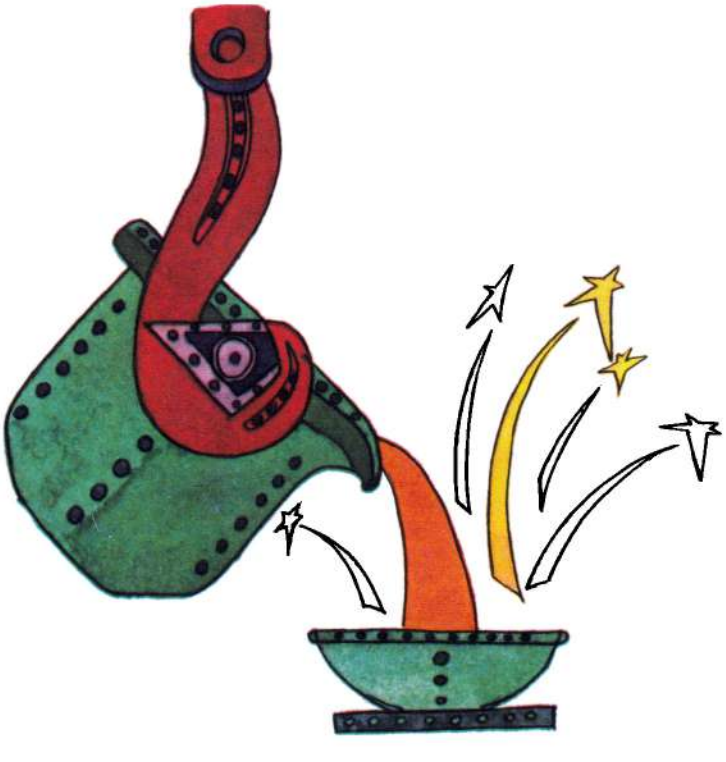
বিদ্যুতের দ্বিতীয় ত্রুটিটি জড়িত তার উৎপাদনের সঙ্গে নয়, পরিবহনের সঙ্গে। আজ বিদ্যুৎ প্রবাহ যে-প্রধান 'নদীগুলো' দিয়ে বইছে তার নাম হচ্ছে — বিদ্যুৎ পরিবহন লাইন। দুঃখের বিষয় এই লাইনগুলোরও অনেক খুঁত রয়েছে। তাতে প্রচুর শক্তি নষ্ট হয়, তারা অনেক জায়গা অধিকার করে, ব্যয়বহুল এবং সংকীর্ণ শহুরে গলির মতো তার 'ধারণ ক্ষমতা' কম। যতই সময় যাবে, আমাদের ততই বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে এবং ততই অধিক সংখ্যক বিদ্যুৎ পরিবহন লাইন গড়তে হবে।

এঞ্জিনিয়াররা নতুন একটি উপায় বাৎলে দিচ্ছেন। তাঁরা বলেন, শক্তি 'জমাট-বাঁধা অবস্থায়' পরিবহন করা হোক। দেখা গেল যে কিছু কিছু বস্তু যদি প্রবল শৈত্যের মধ্যে জমানো যায়, তাহলে তারা বিনা লোকসানে শক্তি পরিবহন করতে সক্ষম। পাতলা জমানো শিরা দিয়ে সরবরাহ করা যায় ঠিক ততটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যতটা সরবরাহ করা যায় বড় একটি গুঁড়ির সমান মোটা ক্যাব্‌ল দিয়ে। তার মানে, বিদ্যুৎ পরিবহন লাইনের বিশাল জালের প্রয়োজন থাকবে না। মূল্যবান তাম্রের সাশ্রয় হবে, লোকে পাবে বেশি শক্তি এবং খেতখামারের জন্য জমির পরিমাণ বাড়বে।

তার জমানো হয় তরল হেলিয়াম গ্যাস দিয়ে। এর জন্য তারকে ধাতব পাইপের মধ্য দিয়ে টানা হয় এবং তাতে প্রবেশ করানো হয় হেলিয়াম। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো হাওয়ার বৈদ্যুতিক নদীর পরিবর্তে বইবে ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক নদী। তা অসম্ভব কিছু নয়।

ব্যস্‌, গল্প শেষ। সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করছি যে সমস্তকিছুর বিষয়ে বলা হল না, অবশ্য সে উদ্দেশ্যও আমাদের ছিল না। বলা হল না, কারণ বইখানি ছোট্ট। আর সে উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ এই সমস্ত জটিল জিনিস নিয়ে লেখা হয়েছে এবং লেখা হচ্ছে অনেক উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক রচনায়।

এই বইখানি লেখার আসল উদ্দেশ্য — শক্তি-বিজ্ঞান নামে মানুষের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি জগতের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া।



পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবভস্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers

17, Zubovsky Boulevard,

Moscow, Soviet Union



